দ্বিতীয় অধ্যায়	মোগল শাসনাধীনে ভারত

'ক' বিভাগ

আকবর ও মোগল সাম্রাজ্যের বিকাশ

আকবরের বাল্যজীবন ও সিংহাসন লাভ ঃ মহান্ মোগল সম্রাট আকবর ১৫৪২ সালের ১৫ই অক্টোবর সিন্ধু অঞ্চলে হামিদাবানু বেগমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হুমায়ুন তখন গভীর সংকটে নিমজ্জিত। শের শাহ্ কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন আশ্রয়ের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে ঘুরছিলেন। পারস্যের পথে পলায়নকালে ভ্রাতা আসকরীর আক্রমণ সংবাদে ভয় পেয়ে হুমায়ুন শিশু আকবরকে ফেলে যান। আসকরী ও তাঁর মহিষী আকবরের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কান্দাহার ও কাবুল অধিকার করে আকবরকে উদ্ধার করেন। আকবর পরিচারিকাদের কাছে শৈশবে লালিতপালিত হন। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহাম্-আন্‌গা। ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পাঁচ বছর বয়স হলে তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পাঠাভ্যাস অপেক্ষা খেলাধূলা ও পশুশিকারের প্রতি আকবরের আকর্ষণ ছিল বেশী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ, কিন্তু পাঠাভ্যাস করার মত ধৈর্য তাঁর ছিল না। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের অপর ভ্রাতা হিন্দলের মৃত্যু হলে আকবরকে আনুষ্ঠানিকভাবে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং হিন্দলের কন্যা রাকিয়া বেগমের সঙ্গে আকবরের বিবাহ হয়। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হুমায়ুনের প্রধান অনুচর বৈরাম খাঁকে আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হলে বৈরাম খাঁ আকবরকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের অবস্থা ঃ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চৌদ্দ বছর বয়সে আকবর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শান্তিপূর্ণভাবে সিংহাসনে আরোহণ করার সৌভাগ্য আকবরের হয় নি। হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবর হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে পাঞ্জাবের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবেই আকবরের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করতে তাঁর বহু সময় লাগে।

আকবরের অভিষেক

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন সত্য, কিন্তু সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারেন নি। সে সময় ভারতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। আকবরের পরিস্থিতি এমনই দুর্বল ও অসহায় ছিল যে, একমাত্র বৈরাম খাঁ ছাড়া তাঁর সকল অনুচররাই তাঁকে ভারত ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। সেই সময় একদিকে দিল্লীর ক্ষমতা নিয়ে মোগল ও আফগানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপর দিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সার্বভৌমত্বের অধিকার নিয়ে সিকন্দর শূর ও মহম্মদ শাহ্ আদিলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জনের জন্য সিকন্দর শূর পাঞ্জাবে সচেষ্ট ছিলেন। অপরদিকে পূর্ব-ভারতে মহম্মদ শাহ্ আদিলের নেতৃত্বে আফগানরা শক্তি সঞ্চয় করছিল। আকবরকে দিল্লীর সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে মহম্মদ শাহ্ আদিলের সেনাপতি হিমু এক বিরাট সেনাদল নিয়ে চুণার থেকে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হলেন। অতি সহজেই হিমু আগ্রা দখল করে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হন। দিল্লীর শাসনকর্তা তার্দিবেগ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। হিমু 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করে নিজেই দিল্লীর ক্ষমতায় আরোহণ করেন।

আকবরের সমস্যা

রাজপুতানার মেবার, বুঁদী, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের শাসকগণ দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের বিরোধিতা আকবরের কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। মধ্য-ভারতে মালব ও গুজরাট সেই সময় স্বাধীন ছিল। গণ্ডোয়ানা রাজ্যের রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে রাজত্ব করছিলেন। উড়িষ্যাও ছিল স্বাধীন। বঙ্গদেশ ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় আফগান প্রভুত্ব বজায় ছিল। দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, খান্দেশ ও বেরার প্রভৃতি মুসলমান রাষ্ট্রগুলি একরূপ স্বাধীন ছিল। সুদুর দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য সমৃদ্ধি ও শক্তিশালী ছিল। পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজরা প্রাধান্য স্থাপন করেছিল এবং গোয়া ও দিউ তাদের দখলে ছিল। পশ্চিমে কাবুল অঞ্চলে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হাকিম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন। কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানও স্বাধীন ছিল।

ভারত শতধা বিচ্ছিন্ন

এক কথায়, আকবরের সিংহাসনারোহণের পূর্বে ভারত ছিল শতধা বিচ্ছিন্ন এবং ভারত নামটি নিছক ভৌগোলিক সংজ্ঞায় (geographical expression) পর্যবসিত হয়।

দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ

আলোচ্য সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। উত্তর-ভারতের সর্বত্র বিশেষত দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে জনসাধারণের দুর্গতিরও শেষ ছিল না। আকবরের সিংহাসনারোহণের পূর্বে এরকম ছিল ভারতের অবস্থা।

হিমুর বিরুদ্ধে আকবর ও বৈরামের অভিযান

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ)ঃ সৌভাগ্যক্রমে, মোগল রাজবংশের অভাবনীয় সঙ্কটের সময় আকবর বৈরাম খাঁর মত এক বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপযুক্ত সেনাপতির সাহায্য লাভ করেন। আকবরের প্রথম সমস্যা ছিল হিমুকে দিল্লী থেকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা। এই উদ্দেশ্যে আকবর ও বৈরাম খাঁ হিমুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পাণিপথের প্রান্তরে হিমু মোগলবাহিনীকে বাধা প্রদান করেন। হিমু হস্তীবাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালালে প্রথম মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ হিমুর চক্ষু তীরবিদ্ধ হলে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান। নেতৃত্বের অভাবে

হিমুর পতন ও মৃত্যু

আফগানবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের ২৫০০ হাতি ও বহু যুদ্ধোপকরণ আকবর ও বৈরামের করায়ত্ত হয়। বন্দী অবস্থায় হিমুকে আকবরের সামনে আনা হল। কেউ কেউ মনে করেন যে, আকবর হিমুকে নিজ হাতে হত্যা করতে অসম্মত হলে বৈরাম খাঁ হিমুর শিরোচ্ছেদ করেন। আবার অনেকের মতে বৈরামের প্ররোচনায় আকবর স্বয়ং হিমুর শিরোচ্ছেদ করেন। স্মিথ বিশ্বাস করেন না যে, আকবরের মত এক দয়াপ্রবণ-ব্যক্তি তাঁর অভিভাবকের প্ররোচনায় হিমুকে হত্যা করেছিলেন। আবুল ফজল-এর মতে আকবর অর্ধমৃত শত্রুকে হত্যা করতে অস্বীকার করেন। স্মিথের মতে হিমুর মৃতদেহ দিল্লীর রাজপথে এক ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

পাণিপথের যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে প্রথমত, মোগল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয়। দিল্লী ও আগ্রা আকবরের হস্তগত হলে ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, আফগানদের ভারতে সার্বভৌম অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা চিরতরে বিলীন হয়। মোগলদের ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রশ্ন সুনিশ্চিত হয়। তৃতীয়ত, মোগল শক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং আকবর হিন্দুস্থানের সম্রাট রূপে অভিনন্দিত হলেন।

শূরবংশের অবসানঃ এরপর আকবর ও বৈরাম খাঁ শূরবংশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পূর্বেই বৈরাম খাঁ সিকন্দর শূরের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান।

সিকন্দর পলাতক হয়ে সিওয়ালিক পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর সিকন্দরের বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী প্রেরিত হয়। সিকন্দর বশ্যতা স্বীকার করে জায়গির পেলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগলের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ শাহ আদিল বাংলার শাসনকর্তার কাছে পরাজিত হয়ে নিহত হন। এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আকবরের তিনটি প্রধান শত্রুর বিনাশ ঘটলে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি ঃ বদাক্‌শান্ নিবাসী বৈরাম খাঁ ছিলেন হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুগত অনুচর। কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রীঃ) তিনি শের শাহের হাতে বন্দী হন। কিন্তু কোনক্রমে পালিয়ে বিতাড়িত সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে পুনরায় যোগদান করেন। হুমায়ুনের সঙ্গে তিনি পারস্যে গিয়ে সেখানে প্রভুর অনুকূলে পারস্য-অধিপতির সাহায্য লাভ করেন। একমাত্র তাঁর সাহায্যে ও প্রচেষ্টায় হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন।

হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর

হুমায়ুনের জীবিতাবস্থায় বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর চার বছর (১৫৫৬-৬০ খ্রীঃ) বৈরামের অভিভাবকত্বাধীন ছিলেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, হিমুর পরাজয় ও দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বৈরামেরই কৃতিত্ব। আকবরের সেই বিপদ্‌সঙ্কুল দিনে বৈরাম তাঁর পাশে না থাকলে মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। পাণিপথের যুদ্ধের পর প্রকৃতপক্ষে বৈরাম খাঁই সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তাঁর পরিচালনাধীনেই আফগান শক্তি বিধ্বস্ত হয় এবং গোয়ালিয়র, জৌনপুর ও আজমীর দখলে আসে।

আকবরের অভিভাবক-রূপে নিযুক্ত

দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা

কিন্তু বৈরাম খাঁ বেশী দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারলেন না। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পতন হয়। তাঁর পতনের কারণ হল ঃ (১) সিয়া মতাবলম্বী মুসলমানদের রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করে বৈরাম খাঁ সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও অশ্রদ্ধা অর্জন করেন। (২) বৈরাম নিজ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের 'সুলতান', 'খাঁ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করলে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। (৩) দণ্ডবিধির ব্যাপারেও তিনি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে রাজপ্রাসাদের বহু কর্মচারীর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। (৪) বৈরাম খাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আকবরের মাতা হামিদাবানু বেগম, ধাত্রী মাতা মহাম্-আন্‌গা ও তাঁর পুত্র আদম খাঁ এবং মহাম্-আন্‌গার আত্মীয় ও দিল্লীর শাসনকর্তা সাহাবউদ্দিন প্রভৃতি সম্রাটের আত্মীয়স্বজনের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। (৫) বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকবর নিজেই বৈরামের অভিভাবকত্বের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন।

বৈরামের পতন ও এর কারণ

এইভাবে বৈরাম খাঁর বিরুদ্ধে রাজধানীতে ষড়যন্ত্র চলছিল এবং অবশেষে সম্রাট মাতা, ধাত্রী মাতা এবং অপরাপর অনেকের প্ররোচনায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৈরাম খাঁ শান্তভাবে সম্রাটের আদেশ মেনে নিয়ে অবসর গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁকে সাম্রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হলে বৈরাম বিদ্রোহী হন এবং সম্রাট তাঁর অপরাধ মার্জনা করে পুনরায় তাঁকে মক্কা যাওয়ার অনুমতি দেন। পথে গুজরাটের কাছে এক আফগানের হাতে বৈরাম নিহত হন।

বৈরামের পদচ্যুতি ও মক্কার পথে যাত্রা

বৈরামের মৃত্যু

বৈরাম খাঁর পতন ও তাঁর মৃত্যুকে ঐতিহাসিক স্মিথ নিন্দা করে বলেছেন যে, এই ঘটনা আকবর ও তাঁর পার্শ্বচরদের কুরুচি মনের পরিচায়ক। স্মিথ-এর মতে ষড়যন্ত্রকারীরা নবীন সম্রাটের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। বৈরাম খাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে এবং তাঁকে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছিল যাতে তাঁর ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়। শেখ্ গাদাই প্রমুখ অনুগামীরা বৈরামকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হওয়ার পরামর্শ দিলেও বৈরাম বেশ কিছু দিন সেই পরামর্শ উপেক্ষা করেন। যদি বৈরামকে তড়িঘড়ি মক্কায় না পাঠানো হত, তা হলে তিনি সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন, যেমন জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক জার্মান-সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বৈরাম বিদ্রোহী হলেও কিন্তু তিনি হৃষ্টচিত্তে গ্রেপ্তারও বরণ করেন। আবুল ফজল* বৈরাম খাঁর দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেও তাঁকে "এক যথার্থ সজ্জন ব্যক্তি ও মহান্ গুণরাজির অধিকারী" বলে উল্লেখ করেছেন। বৈরাম খাঁর পতনের জন্য আবুল ফজল তাঁর দুষ্ট অনুগামীদেরই দায়ী করেছেন। স্মিথ আরও বলেন যে, বৈরাম খাঁর সাহায্যেই হুমায়ুন ও আকবর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। সুতরাং কৃতজ্ঞতার নিদর্শন রূপে শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক ভাবেই বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করা উচিত ছিল। কিন্তু বৈরাম খাঁ-র শত্রুরা ঘৃণ্য উপায়ে তাঁর পতন ঘটায়।

বৈরাম খাঁর পতন সম্পর্কে স্মিথ-এর মন্তব্য

নারী-প্রভাবিত শাসন (১৫৬০-৬৪ খ্রীঃ) : স্মিথের মতে বৈরাম খাঁ-র পদচ্যুতির পর আকবর চার বছর ধাত্রী মাতা মহাম্-আন্‌গা ও অপরাপর আত্মীয়-পরিজনের সম্পূর্ণ পরিচালনাধীনে ছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আকবর সত্যিই মহাম্-আন্‌গার পরিচালনাধীন হতেন তা হলে প্রথমত, বৈরামের চরম শাস্তি হত। কারণ বৈরাম ছিলেন মহাম্-আন্‌গার পরম শত্রু। দ্বিতীয়ত, মহাম্-আন্‌গার পুত্র আদম খাঁ সর্বোচ্চ রাজপদে উন্নীত হতেন। কিন্তু বৈরামের প্রতি শাস্তি কঠোর হয় নি এবং আদম খাঁও উচ্চপদ লাভ করেন নি। এমন কি আকবরের প্রিয়পাত্র শামস্‌উদ্দিন আটকা খাঁ-কে হত্যা করার অপরাধে সম্রাটের আদেশে আদম খাঁ-র মৃত্যুদণ্ড হয়। সম্ভবত আকবর স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেছিলেন, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি অন্তঃপুরের প্রভাবাধীন ছিলেন।

স্মিথের মন্তব্য

আকবরের সাম্রাজ্যবিস্তার : আকবর ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। বৈরাম খাঁর পতনের পর আকবরকে একাধিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় যেমন—খান্ জামানের বিদ্রোহ, আদম খাঁ-র বিদ্রোহ, আবদুল্লা খাঁ-র বিদ্রোহ, উজবেগ বিদ্রোহ প্রভৃতি। এই সকল বিদ্রোহ থেকে আকবরের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি হল যে, এই ভারতে ছোট, বড় স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব সার্বভৌম রাজশক্তির পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি একথাও অনুভব করেন যে, ভারতে রাজনৈতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন। ভারতে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অর্জনের জন্য একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন ও একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল আকবরের রাজ্যবিস্তারের

আকবরের সাম্রাজ্যবাদ ও রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্য

---

* **আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২ খ্রীঃ) :** *আবুল ফজল ছিলেন মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সম্রাট আকবরের অন্তরঙ্গ মিত্র ও সচিব। তিনি ছিলেন শেখ মুবারকের দ্বিতীয় পুত্র এবং সুপ্রসিদ্ধ কবি ফৈজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আবুল ফজলের পিতা ছিলেন আরবদেশীয় এবং মাতা পারসিক। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই সময় থেকে তিনি ইসলাম শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকবরের সভায় প্রবেশ করেন এবং কয়েক বছর পর পাঁচহাজারী মনসবদার-পদে উন্নীত হন। তিনি যে শুধু পণ্ডিত ছিলেন এমন নয়, যুদ্ধবিদ্যায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। দাক্ষিণাত্যে মোগল অভিযানে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যুবরাজ সেলিম আবুল ফজলকে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু বলে মনে করতেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমের আদেশে বীরসিংহ বুন্দেলা আবুল ফজলকে হত্যা করেন। আবুল ফজলের রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'আইন-ই-আকবরী', 'আকবর-নামা', 'ইয়ার-ই-দানিশ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।*

প্রধান লক্ষ্য। দিগ্বিজয় সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ছিল, "A monarch should ever be intent on conquest otherwise his neighbour risein arms against him." প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অবিরাম বিস্তারনীতি অনুসরণ করেন।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, প্রাচীন মৌর্য, পারসিক ও ম্যাসিডোনিয়া সাম্রাজ্যবাদের কোন বৈশিষ্ট্য আকবরের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে লক্ষ্য করা যায় না। আকবরের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সভ্যতার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অবদানও রেখে যান নি। অস্ত্রের সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর যুদ্ধ-নীতির ফলে প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে সমগ্র উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু এই ঐক্যের মূলে ছিল তাঁর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-নীতি ও সংযুক্তিকরণ-নীতি ও কূটনীতির ব্যাপক প্রয়োগ। আবুল ফজল-এর মতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অত্যাচারী ও স্বার্থান্বেষী শাসকদের শাসন থেকে জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই আকবর রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু আকবরের প্রাথমিক রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে আবুল ফজল-এর অভিমতের সত্যতা পরিলক্ষিত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবরই সর্বপ্রথম ভারতে এক সুদৃঢ় ও সুসংহত সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। প্রথম দিকে আকবরের এই সংকল্পের প্রধান অন্তরায় ছিল উত্তর-ভারতের মুসলিম তথা আফগান রাজ্যগুলি। মোগল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়ীকরণ ও সংহতির জন্য আফগান শাসকদের স্বাধীনতার-স্পৃহা ধ্বংস করার প্রয়োজন আকবর অনুভব করেন। দিল্লী সুলতানির মহান্ ঐতিহ্য এবং বিশেষত বলবন ও আলাউদ্দিন খাল্জীর সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ অনুসরণ করে আকবর উত্তর-ভারতের মুসলিম তথা আফগান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এই রাজ্যগুলির বিনাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে আকবর তাঁর উদ্দেশ্য কখনও গোপন করার চেষ্টা করেননি।

আকবর একথাও উপলব্ধি করেন যে উদারতার সঙ্গে ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গের গুরুত্ব বুঝতে না পারলে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে আকবর হিন্দু রাজ্যগুলি সম্পর্কে দিল্লীর সুলতানদের উদারনীতি অনুসরণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পেলেই হিন্দু রাজন্যবর্গ নিজেদের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করতে প্রয়াসী হতেন। সুতরাং আকবর রাজপুতানা অঞ্চলের পূর্বতন হিন্দু রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্যদিকে জয়পুর, বিকানীর প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে শক্তিশালী করে এই অঞ্চলে শক্তিসাম্য বজায় রাখেন। এই নীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্য ও মোগল রাজতন্ত্রের প্রতি একদল নতুন অনুগত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণী ক্রমেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রবল সমর্থকে পরিণত হয়। আকবরের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ ছিল উত্তর-ভারতে স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ভারতের সমগ্র মুসলিম জনগণের ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করা এবং সেইসঙ্গে হিন্দু রাজ্যগুলির একনিষ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন করা। এইভাবে মুসলিম রাজ্যগুলি উচ্ছেদ করে ও হিন্দু রাজন্যবর্গের আনুগত্য লাভ করে আকবর এক ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য আকবরের সাম্রাজ্য গঠনের এই আদর্শ কিন্তু নতুন নয়। আলাউদ্দিন প্রমুখ দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানরাও দিল্লীর রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রয়াসী হন। আকবরও সেই নীতি অনুসরণ করেন—যদিও তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।* প্রসঙ্গত বলা যায় যে, একমাত্র উত্তর-ভারতে

* *ত্রিপাঠী—"Although not entirely new ... he (Akbar) carried to its logical conclusion of the Policy of some of the best ruler of Delhi and brought a new outlook on it"—Some aspects of Muslim Administration—*পৃঃ ১২৯।

একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করার পরেই তিনি মানবতাবাদ আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে রাজত্বের দ্বিতীয় পর্বেই তিনি জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন।

উত্তর-ভারত বিজয় ঃ পাণিপথের যুদ্ধের পর আকবর বৈরাম খাঁর সহযোগিতায় দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর অধিকার করেন। এর পর ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন।

আকবর ছিলেন এক সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরনায়ক। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করবেন। ইতিপূর্বে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালবের আফগান সর্দার বাজবাহাদুরকে দমন করে তার রাজ্য দখল করার জন্য আদম খাঁকে প্রেরণ করেন। বাজবাহাদুরকে পরাস্ত করার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আদম খাঁ সম্রাটের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। ফলে আকবর নিজেই মালবে এসে আদম খাঁকে দমন করেন। তিনি পীর মহম্মদকে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু শীঘ্রই পীর মহম্মদের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে বাজবাহাদুর মালব পুনরুদ্ধার করেন। এই অবস্থায় আকবর আবদুল্লাহ্ উজবেককে মালবে পাঠালেন এবং তিনি বাজবাহাদুরকে বিতাড়িত করে মালব পুনরায় দখল করেন।

মালব

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আসফ খাঁ মধ্য-প্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। গণ্ডোয়ানার রানী দুর্গাবতী তাঁর নাবালক পুত্র বীরনারায়ণের অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করছিলেন। বিপুল বিক্রমের সঙ্গে তিনি মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অবশেষে পরাজিত হয়ে রানী দুর্গাবতী আত্মহত্যা করেন।

গণ্ডোয়ানা

রাজপুতানায় বিস্তারনীতি ঃ আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মোগল প্রভুত্ব স্থাপন করার জন্য রাজপুতদের সহযোগিতা ও মৈত্রী একান্ত প্রয়োজন। প্রথমে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি তাদের আনুগত্য অর্জন করতে চেষ্টা করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজেই জয়পুরের রাজপুত নৃপতি বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিকানীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীমলের পুত্র ভগবানদাসের কন্যার সঙ্গে তিনি আপন পুত্র জাহাঙ্গীরের বিবাহ দেন। এইভাবে যোধপুর, জয়সলমীর, বুঁদী প্রভৃতি স্থানের রাজপুত রাজারা একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। মেবারের রাণা উদয় সিংহ (সংগ্রাম সিংহের পুত্র) আকবরকে 'অপরিচ্ছন্ন বিদেশী' (unclean foreigner) বলে তাঁর সঙ্গে কোন রকমের সম্পর্ক ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। এই কারণে রাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বা মোগল অন্তঃপুরে মেবারের রাজকন্যাকে পাঠাতে কোন মতেই সম্মত হলেন না। উপরন্তু তিনি মালবের রাজ্যচ্যুত রাজা বাজবাহাদুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গুজরাট বিজয়ের পথে চিতোর ছিল প্রধান অন্তরায় এবং দিল্লী ও আহমেদাবাদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য চিতোর দখল করার প্রয়োজন ছিল। সেই সময় রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে মেবার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উত্তর-ভারতে মোগলদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য মেবার জয় করার প্রয়োজন আকবর অনুভব করেন। এই সকল কারণে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর চিতোর আক্রমণ করেন। দুর্বলচেতা উদয় সিংহ পলায়ন করে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়মল ও পত্ত নামে দুজন রাজপুত সেনাপতি বিপুল বিক্রমের সঙ্গে চার মাস কাল মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে গোলার আঘাতে জয়মলের মৃত্যু হয় এবং পত্ত নিহত হন। দুর্গের

রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ চিতোর আক্রমণ (১৫৬৭-৬৮খ্রীঃ)

ভিতরে রাজপুত রমণীরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর মোগলবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হল। আসফ খাঁ মেবারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আকবরের চিতোরবিজয় তাঁর উদার ধর্মনীতি ও সহযোগিতামূলক রাজপুত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। আকবর চিতোর জয়কে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ইসলামের জয় বলে অভিহিত করেছেন।

রণথোম্ভর রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার (১৫৬৯ খ্রীঃ)

চিতোরের পর রণথোম্ভর আক্রান্ত হয় (১৫৬৯ খ্রীঃ)। রাজপুত নরপতি সারজন্‌হারা পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করেন। তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয় ভোজ ও দুদাকে মোগল দরবারে প্রেরণ করেন। তাঁর পুত্রদের প্রতি আকবরের ব্যবহারে প্রীত হয়ে সারজন্‌হারা মোগল্‌দের দাসত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি বারাণসী ও চুণারের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন।

কালিঞ্জর রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার

এর পর অপর রাজপুত রাজ্য কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে মোগল অভিযান নিয়োজিত হয়। কালিঞ্জররাজ এরমধ্যে চিতোহার ও রণথোম্ভরের পতনের খবর পেয়েছিলেন। সুতরাং তিনি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করেন। এলাহাবাদের কাছে তাঁকে জায়গির দেওয়া হল এবং কালিঞ্জরের শাসনভার মোগল সেনাপতি মাজনুর খাঁর হাতে ন্যস্ত হল।

মেবারের রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযান

চিতোহার অধিকার সত্ত্বেও মেবারের ওপর আকবর স্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে উদয়সিংহের মৃত্যুর পর (১৫৭২ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র রাণা প্রতাপ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি মেবারের মর্যাদা পুনঃস্থাপন করার এবং ভারত থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার শপথ গ্রহণ করেন। রাণা প্রতাপ সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন, "Pratap was arrogant, presumptuous, deceitful and disobedient"। স্মিথের মতে, "Pratap's patriotism was his offence"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হলে রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহ ও আসফ খাঁ প্রেরিত হন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটে উভয়পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেও রাণা প্রতাপ পরাজিত হন এবং পর্বতাহারণ্যে আত্মগোপন করেন। একে একে মেবারের দুর্গগুলি মোগলবাহিনীর হস্তগত হল। পরাজিত হলেও রাণা প্রতাপ নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করেন নি। মৃত্যুর পূর্বে (১৫৯৭ খ্রীঃ) তিনি চিতোহার ও আজমীর ব্যতীত প্রায় সমগ্র মেবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীঃ) ও প্রতাপের পরাজয়

প্রতাপ কর্তৃক রাজ্যের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার

মৃত্যুকালে রাণা প্রতাপ ছিলেন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মৃত্যুশয্যায় তাঁর এই দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, রাণা উত্তরে বলেন 'আমার আত্মা এই সান্ত্বনামূলক শপথ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাঁর রাজ্য তুর্কীদের কাছে পরিত্যাগ করা হবে না" ("My soul lingered for some consolatory pledge that his country should not be abandoned to the Turks.") কথিত আছে, অমরসিংহ ও তাঁর অভিজাতরা প্রতাপকে এই আশ্বাস দেন যে, মৃত্যুর পরেও তাঁর সংকল্প পূর্ণ করার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। এই আশ্বাসবাণী প্রতাপকে সন্তুষ্ট করে ও তিনি শান্তিতে প্রাণত্যাগ করেন।

অমর সিংহ ও মোগল (১৫৯৯ খ্রীঃ)

প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমর সিংহ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ ও যুবরাজ সেলিমকে মেবারের বিরুদ্ধে পাঠানো হল। অমর সিংহ পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে উসমানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য মানসিংহ মেবার ছেড়ে

চলে যান। আকবরের জীবিতাবস্থায় মেবারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান পাঠানো হয় নি।

এর পর গুজরাটের প্রতি আকবরের দৃষ্টি পড়ে এবং তা জয় করে সাম্রাজ্যভুক্ত করা হল। হুমায়ুন সাময়িকভাবে গুজরাট দখল করলেও সেখানে মোগল প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে গুজরাট ছিল খুবই সমৃদ্ধ এবং ভারতের সঙ্গে তুরস্ক, সিরিয়া, পারস্য ও ইওরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এছাড়া মক্কার পথে গুজরাটের অবস্থিতি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মক্কার হজ-তীর্থযাত্রীদের যাত্রার নিরাপত্তার জন্য আকবরের গুজরাট দখল করার অপর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে গুজরাট জয়ের পরিকল্পনা করেন। গুজরাটের পরিস্থিতিও অনুকূল ছিল। এই সময় গুজরাটের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সংকটময়। তৃতীয় মুজফর্ খাঁ ছিলেন নামে মাত্র সুলতান ও দুর্বল এবং আধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে গুজরাটের স্বার্থান্বেষী অভিজাতদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছিল। মীরজা নামক আকবরের বিদ্রোহী আত্মীয়স্বজন গুজরাটে আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। গুজরাটের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অশান্তির অবসানকল্পে মুজফর্ খাঁর মন্ত্রী ইতিমাদ খাঁ আকবরের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। আকবর এই সুযোগে এক বিশাল সেনাবাহিনী আহমেদাবাদের পথে পাঠালেন এবং ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজেই গুজরাট আক্রমণ করেন এবং আহমেদাবাদ দখল করেন। তৃতীয় মুজফর্ খাঁ নিকটবর্তী অরণ্যে আত্মগোপন করেন। পরে তিনি বন্দী হন (১৬ই নভেম্বর)। পরের দিন গুজরাটের মন্ত্রী ইতিমাদ খাঁ সম্রাটের কাছে উপস্থিত হয়ে আহমেদাবাদ নগরীর চাবি সমর্পণ করেন। আকবর ইতিমাদ খাঁর হাতে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং এর বিনিময়ে গুজরাটের সবশ্রেণীর মানুষের সংযত আচরণের জন্য ইতিমাদ খাঁকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন। এর পর আকবর সবরমতী নদীর তীরে এসে হাজির হলেন এবং সেখানে তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। গুজরাটের প্রশাসনের জন্য আকবর গুজরাটের এক অংশে মীর্জা আজিজ কোকাকে ও অন্য অংশে ইতিমাদ খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর পর আকবর ক্যাম্বে-র দিকে অগ্রসর হন এবং হাকিম আইন-উল-মুলক্-কে গুজরাটি অভিজাতদের ওপর নজর রাখার নির্দেশ দেন। কারণ গুজরাটি অভিজাতদের আনুগত্য সম্বন্ধে আকবরের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ক্যাম্বে বন্দরে তুর্কী, সিরিয়, ইরানী ও পর্তুগীজ বণিক্‌রা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট ক্যাম্বের বিদেশী বণিক্‌দের সব-রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। এর পর সম্রাট সুরাট দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন (১৫৭৩ খ্রীঃ) এবং সুরাট অবরোধ করেন। সে সময় সুরাট হুমায়ুনের এক বিশ্বস্ত অনুচর হামজাবান-এর দখলে ছিল। সম্রাটের সুরাট অভিযানের সংবাদ পাওয়া মাত্র হামজাবান একদল পর্তুগীজ গোলন্দাজ সংগ্রহ করেন। কিন্তু মোগলদের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে হামজাবান ও তাঁর পর্তুগীজ গোলন্দাজরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। হামজাবান বন্দী হন। পর্তুগীজরা প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সম্রাট পর্তুগীজদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এই মিত্রতার কারণ ছিল পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের সামুদ্রিক আধিপত্য এবং হেজ্জাজে মুসলিম তীর্থযাত্রীদের চলাচলের পথ সুরক্ষিত করা। কুলিজ খাঁকে সুরাট দুর্গের অধিনায়ক নিযুক্ত করে আকবর আহমেদাবাদে কিছু সময় অবস্থান করেন (১৫৭৩ খ্রীঃ) এবং নতুন বিজিত অঞ্চলের জন্য কিছু বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খান-ই-আজম-কে গুজরাটের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সু-ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়; মুজফ্‌ফর খাঁ তুরবাতিকে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আকবর ফতেপুর সিক্রীতে ফিরে আসেন। আবুল ফজলের পিতা মোবারক আকবরকে তাঁর "মহান্ বিজয়ের" ("Glorious victories") জন্য অভিনন্দিত করেন এবং সেইসঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বাত্মক

গুজরাট বিজয় (১৫৭২ খ্রীঃ)

ক্ষমতা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ আকবরকে যথেষ্ট প্রলোভিত করে এবং ছয় বছর পর তিনি এই বিষয়ে আগ্রহী হন (১৫৭৯ খ্রীঃ)।

গুজরাট জয়ের গুরুত্ব

গুজরাট বিজয় আকবরের রাজত্বকালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে, (১) পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলির ওপর মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল রাজকোষের আয় বৃদ্ধি পায়, (২) পর্তুগীজদের সঙ্গে সম্রাটের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল এবং মোগলরা নৌ-শক্তির গঠনের সুযোগ পায়, (৩) গুজরাটের ভিতর দিয়ে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হল।

বাংলাদেশ বিজয় (১৫৭৬-১৬০৫ খ্রীঃ)

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে কর্‌রানী (Karrani) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সুলতান সুলেমান আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দাউদ মোগলের প্রভুত্ব অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলে টোডরমল ও মুনিম খাঁ কর্তৃক দাউদ আক্রান্ত হন। তুকারই এবং রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৫-১৫৭৬ খ্রীঃ) দাউদ পরাজিত ও নিহত হলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আইনত বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে সেখানে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বহুদিন পর্যন্ত মোগলদের কর্তৃত্ব বাংলার রাজধানী তাণ্ডা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত ছিল। এই অঞ্চলের বহির্দেশে ছিল অগণিত স্বাধীন জমিদার এবং বিক্ষুব্ধ ও ছিন্ন-ভিন্ন আফগান জনগোষ্ঠী। মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশে মোগল শিবিরে এক ব্যাপক বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং তা বিহার ও জৌনপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ঘোড়ার উপর 'দাগ' দেওয়ার জন্য জায়গিরদারদের বাধ্য করা এবং মোগল কর্মচারী ও জায়গিরদের আয়ের হিসাব কঠোরভাবে আদায় করার প্রচেষ্টা। কিছু ধর্মান্ধ উলেমা এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায় কারণ তারা আকবরের ধর্মীয় উদারনীতি সহজমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এছাড়া এই উলেমাদের কাছ থেকে কর-মুক্ত জমি-জায়গা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাও তাঁদের বিরোধিতার অপর কারণ। আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হাকিমও এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগান। তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যদিকে এই সময় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় পূর্ব-ভারতে আফগানরাও বিক্ষুব্ধ ছিল এবং মোগল-বিরোধী বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল।

বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহ

বাংলায় মোগল কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক বাদ-বিসম্বাদ, সুযোগ্য অধিনায়ক মুনিম খাঁর মৃত্যু, বিদ্রোহী আফগানদের আক্রমণের সম্ভাবনা প্রভৃতি কারণে মোগল শিবিরে প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। মোগল সেনা ও সেনানায়কদের অধিকাংশ বাংলা পরিত্যাগ করে দিল্লী অভিমুখে চলে যায়। ফলে বাংলা ও বিহার মোগলদের হস্তচ্যুত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও বিহার বিদ্রোহীদের দখলে আসে এবং তারা মীর্জা হাকিমকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। এই অবস্থায় আকবর বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে একদল মোগলবাহিনী পাঠালেন এবং রাজা মানসিংহকে মীর্জা হাকিমের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন। রাজা টোডরমল ক্ষিপ্রতালে পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন।

মোগল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও আকবরের ভূমিকা

অন্যান্য যুগের মত মোগল যুগেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছিল। বহিরাগত মুসলিম শাসকবর্গ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তাই তাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সুলতানি যুগে মোঙ্গল আক্রমণ দিল্লীর সুলতানি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। মোগল

আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যার দুটি সুস্পষ্ট দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা থেকে কাবুল ভারতীয় রাজনীতির বৃত্তে অঙ্গীভূত হয়। কাবুলের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য কান্দাহার ও হিরাট-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা প্রয়োজন ছিল। কান্দাহার মোগল সাম্রাজ্যের 'প্রথম রক্ষা প্রাচীর' রূপে বিবেচিত হয়—কারণ কান্দাহার হাতছাড়া হয়ে গেলে পারস্য ও মধ্য-এশিয়া থেকে যে কোন অভিযানকারী ভারতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবে। আলোচ্য সময়ে পারস্যে 'সাফাভি' বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—এই রাজবংশ খুবই প্রভাবশালী ছিল। এছাড়া কান্দাহার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পশ্চিম-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোগল সম্রাটগণ দুর্ধর্ষ উপজাতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন।

বিচক্ষণ সম্রাট আকবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করেন। মোগল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কান্দাহার অঞ্চল দখলের সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়া উজবেক নামক আফগান পার্বত্য জাতির ক্ষমতাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হন।

কাবুলের অধিপতি ও আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা হামিক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু রাজা মানসিংহ ও ভগবান দাসের প্রবল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে মীর্জা হাকিম লাহোর দখলে ব্যর্থ হন। আকবরও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। অনন্যোপায় হয়ে মীর্জা হাকিম ফিরে এলেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বিনা বাধায় কাবুলে প্রবেশ করেন। মীর্জা হামিক আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে অসম্মত হলে আকবর মীর্জা হাকিমের ভগিনীর হাতে কাবুলের শাসনভার তুলে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। এক নারীর হাতে একটি রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করে আকবর উদারতার ও মহানুভবতার পরিচয় দেন।*

কাবুল বিজয়

কাবুল অভিযানের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে আকবরের দৃষ্টি পড়ল। এই সময় মোগলদের শত্রু উজবেকদের নেতা আবদুল্লাহ্ খাঁ উজবেক মধ্য-এশিয়ায় আধিপত্য প্রসারে উদ্যোগী হন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৈমুর-বংশীয়দের শাসনাধীন বাদাখশান দখল করেন। এর পর তাঁর দৃষ্টি ছিল কাবুলের ওপর। মীর্জা হাকিম ও তৈমুরবংশীয়রা বাদাখশান থেকে উৎখাত হলে—তাঁরা আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মীর্জা হাকিমের মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় আকবরের আদেশে মানসিংহ কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আকবর নিজেই সিন্ধুনদের উপকূলে এসে উপস্থিত হন। কাবুলের দিকে উজবেকদের অগ্রগতি অবরোধ করার জন্য আকবর একই সঙ্গে কাশ্মীর ও বেলুচিস্তানের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী পাঠালেন (১৫৮৬ খ্রীঃ)। আকবরের এই উদ্যোগের ফলে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা ও বেলুচিস্তানে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খাইবার গিরিপথের দিকেও মোগল অভিযান পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলের উপজাতিরা শেষপর্যন্ত মোগলদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যু হলে কাবুল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

কাবুল বিজয়ের ফলে (১) আকবরের বিরুদ্ধে ভারতের গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধিতার অবসান হয়; (২) আফগানিস্থান থেকে সেনাসংগ্রহের বাধা দূর হল এবং এরপর এই অঞ্চল থেকে সেনা সংগ্রহ করে মোগলবাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পেল ; (৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে ভারতে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হল।

কাবুল বিজয়ের ফলাফল

১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ভাকার দুর্গ দখল করেন। এর পর তিনি সিন্ধুর দক্ষিণাঞ্চল দখল

* *"The handing over of the Kingdom to a Woman was symbolic of Akbar's broad mindedness and liberalism"—Satish Chandra—Medieval India—Part II* পৃঃ- ১৫৫।

করতে প্রয়াসী হন—কারণ এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোগল আধিপত্য স্থাপন সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া সিন্ধুর দাক্ষিণাঞ্চলের ভিতর দিয়ে কান্দাহার বিজয়ের পরিকল্পনাও আকবরের ছিল। সেই সময় কান্দাহার পারস্যের রাজা শাহ্ আব্বাসের দখলে ছিল।

সিন্ধু বিজয়

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের আদেশে মুলতানের মোগল শাসনকর্তা আব্দুর রহমান আট্টা (নিম্ন সিন্ধু) দখল করার জন্য অগ্রসর হন। আট্টার অধিপতি মীর্জা জানিবেগ আত্মসমর্পণ করেন। এইভাবে সমগ্র সিন্ধু বিজয় সম্পন্ন হল।

বেলুচিস্তান ও কান্দাহার বিজয়

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে মীর মাসুম বেলুচিস্তানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সেই সময় পর্যন্ত বালুচিরা আকবরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নি। মোগল বাহিনী বেলুচিস্তানের সিরি দুর্গটি আক্রমণ করে 'পানি' আফগানদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এইভাবে মাকরাণসহ সমগ্র বেলুচিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের দখলভুক্ত কান্দাহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান শুরু হয়। কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তার সঙ্গে পারস্য-সম্রাটের সম্পর্ক ছিল তিক্ত। এই অবস্থায় পারসিক শাসনকর্তা মোগলদের হাতে কান্দাহার দুর্গ সমর্পণ করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ পারসিক শাসনকর্তা হুসেন মীর্জাকে পাঁচহাজারী মন্‌সব ও জায়গির দেওয়া হয়। কান্দাহার বিজয় সম্পন্ন হলে সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযান ঃ কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু, কাশ্মীর ও বেলুচিস্তান দখল হওয়ায় উত্তর-ভারতে মোগল প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর আকবর দক্ষিণ-ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। দাক্ষিণাত্যের সিয়া-সুলতানি রাজ্যগুলির ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করার বাসনা অনেক আগে থেকেই আকবরের ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং এই ব্যাপারে বিন্ধ্যপর্বত কোন রকম প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীনকালে সমুদ্রগুপ্তই সর্বপ্রথম দক্ষিণ-ভারতের ওপর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপন করেন। মধ্যযুগে আলাউদ্দিন খাল্‌জী ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা শক্তিশালী হিন্দু রাজবংশের সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে সারা ভারতে সার্বভৌমত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হন। তুঘলক সুলতানরা দাক্ষিণাত্য জয় করলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয়। দিল্লীর তুর্কী-সুলতানদের পতনের পর গুজরাট, মালব, উড়িষ্যা প্রভৃতি আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। দিল্লীর সুলতানদের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ মোগলরাও গ্রহণ করে। তা মেনে নেওয়া ছাড়া মোগলদের আর অন্য উপায় ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণজনিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত-সমস্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় নীতির বিবর্তন এবং সর্বোপরি দলছুট ও আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কিত সমস্যা প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন ক্রমেই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এ ছাড়া ভারতের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার প্রশ্নও জরুরী হয়ে ওঠে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের গুরুত্ব মোগলরা বিশেষত আকবর স্পষ্টই অনুভব করেন।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার মত শক্তি ও সময় বাবর ও হুমায়ুনের ছিল না। অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাহমনী রাজ্যের শেষ সুলতানের প্রার্থনা বাবর প্রত্যাখ্যান করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার মত সময় বা ইচ্ছা শের শাহের ছিল না। কিন্তু রাজত্বের শুরুতেই দাক্ষিণাত্যের সিয়া রাজ্যগুলি দখল করার বাসনা আকবরের মনে জাগে। সে সময় দাক্ষিণাত্য ছিল শতধা-বিভক্ত এবং এই কারণে দুর্বল।

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান কলিম-উল্লাহ্-এর মৃত্যু হলে বাহমনী রাজ্যের অবসান ঘটে। বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর যে পাঁচটি রাজ্যের উৎপত্তি হয় সেগুলির ইতিহাস হল ধারাবাহিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ইতিহাস। এইসব রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের সংঘর্ষ প্রায় একটানা চলতে থাকে। এইসময় দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ রাজ্যটি অত্যন্ত পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন পঞ্চরাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠা ও আরব সাগরের ওপর তাদের প্রাধান্য এই অঞ্চলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। তারা মক্কাগামী মুসলিম তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে নানা আপত্তিজনক কর আদায় করত ও তাদের ওপর নানা ধরনের উৎপাত করত। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছাড়াও পর্তুগীজরা এই অঞ্চলের মানুষদের ধর্মান্তকরণের চেষ্টাও করত। পর্তুগীজদের দৌরাত্ম্যের কথা আকবরের অজানা ছিল না এবং তিনি তা বন্ধ করার সংকল্প করেন। উপরন্তু সারা ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। সুতরাং আকবরের দাক্ষিণাত্য অভিযানের মূলে ছিল (১) দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ; (২) পর্তুগীজদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা এবং (৩) উত্তর-ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের সংযুক্তি ঘটিয়ে মোগল সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে আকবরের প্রাথমিক পরিকল্পনা

মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে খান্দেশ রাজ্যের অবস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই এই রাজ্যটির প্রতি আকবরের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে মালব বিজয়ের সূত্র ধরে খান্দেশের সঙ্গে আকবর তথা মোগল সাম্রাজ্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মালবের বিদ্রোহী শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ খাঁ উজবেক-কে দমন করার উদ্দেশ্যে আকবর মালবের দিকে অগ্রসর হলে খান্দেশের সঙ্গে মোগলদের সরাসরি যোগাযোগ হয়। মাণ্ডু-তে অবস্থানকালে আকবর খান্দেশের শাসক মীরণ মুবারক শাহের কন্যাকে বিবাহ করার দাবি জানালেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট অধিকৃত হওয়ায় খান্দেশের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং খান্দেশ সম্পর্কে আকবরের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া গুজরাটের বিদ্রোহী 'মীর্জারা' খান্দেশে আশ্রয় নেওয়ায় আকবরের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়। ইতিমধ্যে আহম্মদনগর খান্দেশের পূর্ব সীমান্তের বেরার রাজ্যটি দখল করলে দাক্ষিণাত্যের শক্তি-সাম্যের বিপর্যয় ঘটে। এই অবস্থায় আকবর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খান্দেশ জয় করে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে বিধ্বস্ত করতে উদ্যোগী হন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এক বিশাল মোগল বাহিনী খান্দেশ আক্রমণ করে ও খান্দেশের নতুন শাসক রাজা আলি খাঁকে তাঁর রাজধানীতে অবরুদ্ধ করে। বাহরানপুর দুর্গের পতন আসন্ন হয়ে ওঠায় রাজা আলি খাঁ প্রচুর অর্থ দিয়ে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। মোগলদের খান্দেশ বিজয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যর্থ হলেও, মোগলদের দাক্ষিণাত্য নীতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। খান্দেশ মোগল সাম্রাজ্যের করদ-মিত্র রাজ্যে পরিণত হওয়ায় দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্টাংশ জয় করার পথ প্রশস্ত হয়।*

খান্দেশ

এরপর খান্দেশের দক্ষিণে অবস্থিত সুবিস্তৃত আহম্মদনগর রাজ্যের ওপর আকবরের দৃষ্টি পতিত হল। গুজরাট থেকে পলাতক মোগল বিদ্রোহী মুজফ্‌ফর হুসেন মীর্জাকে আহম্মদনগরের

---

* *এ. এল. শ্রীবাস্তব—"...that Kingdom (Khandesh) became a Vassal state of the empire and thus paved the way for the future conquest of the rest of the Deccan"—Akbar the Great—প্রথম খণ্ড — পৃঃ—৩৮৯।*

সুলতান মুর্তাজা নিজাম শাহ্ আশ্রয় দেওয়ায় আকবরের ক্ষোভের কারণ হয়। এ ছাড়া নিজাম শাহ্ বেরার দখল করে মাণ্ডুর দক্ষিণে মোগল সীমান্তে সেনা সমাবেশ করেন। আকবর আহম্মদনগরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শীঘ্রই সেই সুযোগ এল। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মীর মুর্তাজা প্রমুখ আহম্মদনগরের কয়েকজন অভিজাত সেই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সালাবৎ খাঁ-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে মোগল দরবারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর মালবের মোগল শাসনকর্তা খান-ই-আজমকে বেরার দখল করে আহম্মদনগরের বিদ্রোহী নেতাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দেন। খান্দেশের শাসক রাজা আলি খাঁ মোগলদের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে মিত্র থাকা সত্ত্বেও আহম্মদনগর রাজ্যের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে মোগলবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত মোগলবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় (১৫৮৬ খ্রীঃ)।

আহম্মদনগর

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আহম্মদনগরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আর একটি সুযোগ পেলেন। সে সময় আহম্মদনগরের শাসক মুর্তাজা নিজাম শাহের বিরুদ্ধে কয়েকজন অভিজাত বিদ্রোহী হয়ে নিজাম শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে ভ্রাতা বারহান-উদ্দিন-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং বারহান-উদ্দিন পরাস্ত হন। তিনি পালিয়ে মোগল দরবারে আসেন। আকবর বারহান-উদ্দিনের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তিনি বারহান-উদ্দিনকে মোগলবাহিনীর সেনানায়ক নিযুক্ত করে আহম্মদনগর অভিযানে পাঠান। আকবর মালবের শাসনকর্তা খান-ই-আজম ও খান্দেশের শাসক রাজা আলি খাঁ-কে বারহান-উদ্দিনকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত বারহান-উদ্দিন আহম্মদনগরের প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করে সেখানে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং 'বারহান-মুলক' অভিধা গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে বারহান-মুলক মোগলদের প্রতি আনুগত্য বর্জন করেন। তাঁর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শাসকরাও মোগলদের প্রতি মৌখিক আনুগত্য বর্জন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, আকবর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে খান্দেশ, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের চারটি রাজ্যের শাসকদের কাছে মোগল রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে তাঁদের আনুগত্য দাবি করেন। তিনি তাঁদের এই প্রতিশ্রুতি দেন যে আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। অন্যথা তাঁদের কঠোর হাতে দমন করা হবে। খান্দেশের সুলতান আলি খাঁ বশ্যতা স্বীকার করে নেন—কিন্তু অপর তিন সুলতান বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করতে অসম্মত হন। এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আকবরের কাছে আর কোন উপায় রইল না।

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বারহান-উল-মুলক-এর মৃত্যু হলে নিজামশাহী অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়। আহম্মদনগরের সিংহাসনের ওপর চার দাবিদারদের মধ্যে বাহরানের পুত্র বাহাদুরের দাবি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্ বাহাদুরের দাবি সমর্থন করেন। আহম্মদনগরের এই উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে চাঁদবিবি নামে এক বীরাঙ্গনার আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন বিজাপুরের ভূতপূর্ব সুলতানের বিধবা পত্নী ও বারহানের ভগিনী। চাঁদবিবি ইব্রাহিম আদিল শাহের নাবালকত্বকালে প্রায় দশ বছর রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বাহরানের মৃত্যু হলে চাঁদবিবি আহম্মদনগরে এসে ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুরের পক্ষ গ্রহণ করেন। এই পরিস্থিতিতে আহম্মদনগরের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী মোগলদের সাহায্য প্রার্থনা করে।

এই সুযোগে আকবর গুজরাটের শাসনকর্তা যুবরাজ মুরাদ ও সেনাপতি আব্দুর রহিম খানের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী পাঠালেন। আহম্মদনগরের অভিজাতদের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বের কারণে

রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। সুতরাং অতি সহজেই মোগলবাহিনী আহম্মদনগর দুর্গে নাবালক রাজা বাহাদুরসহ চাঁদবিবিকে অবরুদ্ধ করে। প্রায় চারমাস চাঁদবিবি প্রচণ্ডভাবে মোগলদের প্রতিরোধ করেন। শেষে দু'পক্ষ মীমাংসায় উপনীত হয়। মোগলদের হাতে বেরার অঞ্চলটির বিনিময়ে বাহাদুরকে আহম্মদনগরের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (১৫৯৬ খ্রীঃ)।

মোগলরা বেরার আদায় করে নিলে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। সুতরাং তারা আহম্মদনগরের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলদের বেরার দখল করার বিরুদ্ধে এক শক্তিজোট গঠন করে। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহম্মদনগরের সম্মিলিতবাহিনী বেরার আক্রমণ করে। কিন্তু মোগলদের কাছে এক যুদ্ধে তারা পরাস্ত হয় (১৫৯৭ খ্রীঃ)। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে চাঁদবিবিকে মোগলদের মোকাবিলা করতে হয়। কোন দিক থেকে কোন রকম সাহায্য না পাওয়ায় চাঁদবিবি মোগলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। আহম্মদনগরের অভিজাতদের এক গোষ্ঠী চাঁদবিবিকে প্রতারক বলে অভিযুক্ত করে হত্যা করে। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে এক রোমাঞ্চকর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সামরিক শিবিরে বাদ-বিসম্বাদের ফলে মোগলবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই কারণে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগলবাহিনী আহম্মদনগরের অবরোধ তুলে নেন ও শীঘ্রই আহম্মদনগর-সরকার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে বেরার পুনর্দখল করেন। মোগল সামরিক শিবিরে বিশৃঙ্খলার কারণে মোগলবাহিনী চূড়ান্ত জয়লাভে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় সম্রাট আকবর নিজেই দাক্ষিণাত্য অভিযানে অগ্রসর হন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদের কাছে দৌলতাবাদের পতন ঘটে। পরের বছর আহম্মদনগরের কিছু অংশ মোগলদের দখলে আসে, যদিও এখানকার অভিজাতরা যুদ্ধ চালিয়ে যান।

আহম্মদনগরের কিয়দংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত (১৬০০ খ্রীঃ)

ইতিমধ্যে খান্দেশের আলি খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী মীরণ বাহাদুর শাহ্ মোগলের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজেই দাক্ষিণাত্যে এসে আসীরগড় দুর্গ অবরোধ করেন। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আসীরগড় দুর্গটি অধিকৃত হয়। পর্তুগীজদের মতে প্রতারণার সাহায্যে আকবর এই দুর্গটি অধিকার করেছিলেন। আসীরগড় আকবরের শেষ রাজ্যজয়। যুবরাজ দানিয়েলের হাতে বেবার, আহম্মদনগর ও খান্দেশের শাসনভার অর্পণ করে আকবর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

খান্দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও পতন

দাক্ষিণাত্যের তিনটি সুলতানি রাজ্যের ওপর মোগল প্রভুত্ব কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। অধিকৃত রাজ্যগুলির পূর্বতন স্থানীয় কর্মচারীরা সর্বত্র মোগল শাসনের বিরোধিতা করতে থাকেন। দিল্লী থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় দাক্ষিণাত্যে মোগল কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হতে পারে নি। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী দাক্ষিণাত্যের অপর দুই রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর মোগল অধিকৃত উপরোক্ত তিনটি রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে বিরোধিতা অব্যাহত রাখে।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফলাফল

মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আকবর ঃ মোগল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বাবর অথবা আকবর, এই প্রশ্নে ঐতিহাসিক মহলে কিছু মতভেদ আছে। একথা সত্য যে, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন। ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, "পাণিপথের যুদ্ধে বিজয়ের ফলে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্য বাবরের হস্তগত হয়। লোদী বংশের ধ্বংস সাধিত হলে হিন্দুস্থানের সার্বভৌমত্ব চাঘতাই তুর্কীদের হস্তগত হয়।" বাবরকে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় এই কারণে যে, তিনি লোদী বংশের কর্তৃত্ব খর্ব করে মোগল-সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবর খানুয়ার যুদ্ধে রাণা সংগ্রামের নেতৃত্বাধীন রাজপুত শক্তি সমবায়ের ওপর চরম আঘাত হানেন। রাসব্রুক উইলিয়াম-এর মতে খানুয়ার সাফল্য ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাবর মেদিনী রাওকে পরাজিত করে চান্দেরীর দুর্গ দখল করেন। পরবছর তিনি ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীকে ঘর্ঘরার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে বাবর মোগল-সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করতে পারতেন এবং সেই ক্ষেত্রে আফগানদের পুনরুত্থান সম্ভব হত না। বাবরের অকালমৃত্যুর ফলে সাম্রাজ্যের দৃঢ়ীকরণের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায় এবং তাঁর সৃষ্ট সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙে পড়ে।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রীঃ) শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি দিল্লী ও আগ্রা থেকে বিতাড়িত হন। এইভাবে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। যা হোক, মৃত্যুর পূর্বে (১৫৫৬ খ্রীঃ) হুমায়ুন কান্দাহার, কাবুল, পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। এই ক্ষেত্রেও হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপজ্জনক হয়। আকবর এক অনিশ্চিত ও কম্পমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই আগ্রা ও দিল্লীর শাসনকর্তা তার্দিবেগ হিমু কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার দুঃসংবাদ আকবরকে বিচলিত করে। সেই সময় আকবর ছিলেন পাঞ্জাবে এবং তাঁর অবস্থা ছিল সঙ্কটজনক। সিকন্দর শূর তখনও পাঞ্জাবে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মোগলদের এক প্রবল শত্রু। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে বাবর কর্তৃক স্থাপিত মোগল-সাম্রাজ্যের কোন অংশই আকবরের প্রকৃত দখলে ছিল না। এই ক্ষেত্রে আকবরকে নতুন ভাবে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাজে নজর দিতে হয়। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তিনি দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। সিকন্দর শূর পরাস্ত হয়ে আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে পাঞ্জাব আকবরের দখলে আসে। এর পর একে একে গোয়ালিয়র, গণ্ডোয়ানা, চিতোর, গুজরাট, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, কাবুল, সিন্ধু, কান্দাহার, আহম্মদনগর প্রভৃতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে কূটনীতি ও অস্ত্রের সাহায্যে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি সর্ব-ভারতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। মোগল সিংহাসনের পুনরুদ্ধার, সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও তার স্থিতীকরণ প্রভৃতি সকল দিক থেকে বিচার করলে আকবরকে মোগল-সাম্রাজ্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। ঐতিহাসিক টড্ (Todd) আকবরকে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায় "Akbar was the real founder of the empire of the Mughals"।

আকবরের আমলে মোগল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, সে সময় ভারত ছিল বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ কর্তৃক শাসিত। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সমগ্র উত্তর-ভারতে মোগল প্রভুত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং গোদাবরী পর্যন্ত মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর আমলে ১৮টি প্রদেশ মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—(১) দিল্লী, (২) আগ্রা, (৩) অযোধ্যা, (৪) এলাহাবাদ, (৫) আজমীর, (৬) গুজরাট, (৭) বাংলাদেশ, (৮) বিহার, (৯) উড়িষ্যা, (১০) মালব, (১১) সিন্ধু, (১২) মুলতান, (১৩) লাহোর, (১৪) কাবুল, (১৫) কাশ্মীর, (১৬) খান্দেশ, (১৭) আহম্মদনগর ও (১৮) বেরার।

আকবরের রাজপুত-নীতি ঃ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের পরাজয় ঘটলেও উত্তর-ভারতে রাজপুত-শক্তি সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয় নি যেমন তালিকোটার যুদ্ধে (১৫৬৫ খ্রীঃ) পরাস্ত হলেও দক্ষিণ-ভারতে হিন্দু-শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নি। দুই শতাব্দীর পূর্বে হিন্দু-শক্তির যে পুনরুজ্জীবন ঘটে, তার রেশ অব্যাহত থাকে।

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের পরাজয়ের পরও শাসক জাতি ও সামরিক শক্তি হিসেবে উত্তর-ভারতে রাজপুতদের প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকে। শের শাহ্ রাজপুত রাজন্যদের অনেককে শক্তির পরিবর্তে প্রতারণার মাধ্যমে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে রাজপুতরা নতুন করে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সাময়িকভাবে সমকালীন রাজনীতিতে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে উদারতার প্রসার ঘটায় সেরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি। আকবরই সর্বপ্রথম বিচক্ষণতা ও উদারতার সঙ্গে রাজপুতদের মত এক সংগ্রামশীল জাতিকে মোগল রাজবংশের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ করে তাদের বিরোধিতার অবসান ঘটাতে আগ্রহী হন। এই দিক দিয়ে আকবরের রাজপুত-নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপলব্ধি করেন যে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সামরিক শৌর্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে তদানীন্তন ভারতে রাজপুতরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁদের বিরোধিতা মোগল-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। সম্রাটের অনুচরবর্গের অধিকাংশই ছিল ভাগ্যান্বেষী ও লোভী। বাংলাদেশে মোগল সেনা ও সমর অধিনায়করা বারংবার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামে। এরূপ অবস্থায় রাজপুতদের সঙ্গে সহযোগিতার গুরুত্ব আকবর উপলব্ধি করেন। রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের মূলে আকবরের উদ্দেশ্যে ছিল পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতার সংকোচন। কারণ পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের আনুগত্যের ওপর আকবরের আস্থা ছিল না। প্রসঙ্গত বলা যায়, যে সকল রাজবংশ ভারত শাসন করেছিল, তাদের মধ্যে তৈমুরের বংশের ভিত্তি ছিল সর্বাধিক দুর্বল ("Of all dynasties that had yet ruled in India that of the Tamurlane was the most insecure in its foundation")। সাম্রাজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তার জন্যই হিন্দু তথা রাজপুতদের সহানুভূতি অর্জন করতে তিনি আগ্রহী হন।

এই নীতির পশ্চাতে যুক্তি

আকবরের রাজপুত-নীতির প্রয়োগ ঃ আকবরের রাজপুত-নীতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতির সমাবেশ ঘটেছিল—তিনি সমান্তরালভাবে মিত্রতা ও সংঘর্ষের পথ অনুসরণ করেছিলেন। যেখানে তাঁর কূটনীতি ও মিত্রতা বাধা পেয়েছে সেখানেই তিনি সংঘাতে লিপ্ত হন।

(ক) মিত্রতার নীতি ঃ (১) **বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন ঃ** তিনি বিভিন্ন রাজপুত রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে যত্নবান হন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিকানীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জয়পুরের ভগবান দাসের কন্যার সঙ্গে আপন পুত্র সেলিমের বিবাহ দেন। আকবরের এই বৈবাহিক নীতির প্রসঙ্গে ডক্টর বেণীপ্রসাদ বলেন, "It symbolised the dawn of a new era in Indian politics."। এর ফলে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতি অধিকাংশ রাজপুত নৃপতিবর্গের শুধু যে বিরোধিতারই অবসান হয়েছিল তা নয়, তাঁদের সাহায্যে প্রায় সমগ্র ভারতে মোগলের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) **রাজপুতদের উচ্চপদে নিয়োগ ঃ** সামরিক ও বে-সামরিক বিভাগের উচ্চপদে রাজপুতদের নিয়োগ করে আকবর তাঁদের আনুগত্য লাভ করেন। এদের মধ্যে রাজা টোডরমল,* রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

* **টোডরমল ঃ** টোডরমল ছিলেন আকবরের মন্ত্রীদের অন্যতম। টোডরমল ছিলেন পাঞ্জাবের টণ্ডন ক্ষত্রী-বংশজাত। তাঁর জন্ম হয় উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত কাহারপুর নামক এক গ্রামে। অনেকের মতে টোডরমল শের শাহের অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। আকবরের আমলে তিনি সামান্য এক কর্মচারী থেকে ধীরে ধীরে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের গুণে ভকিলের পদে উন্নীত হন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি একাধারে ছিলেন সুদক্ষ সৈনিক, রণকুশলী সেনাপতি ও সুদক্ষ প্রশাসক। মোগলদের বিভিন্ন অভিযানে ও কূটনৈতিক স্বার্থে আকবর টোডরমলকে পাঠাতেন। তাঁকে চিতোর (১৫৬৭ খ্রীঃ), রণথোম্ভর (১৫৬৮ খ্রীঃ) ও বাংলা অভিযানে (১৫৭৫ খ্রীঃ) প্রেরণ করা হয়েছিল। বাংলার দাউদ খাঁ কররানীর বিরুদ্ধে টোডরমল

আকবর উদার রাষ্ট্রীয় ও ধর্মনীতি অনুসরণ করে এবং হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া-কর তুলে দিয়ে হিন্দু তথা রাজপুতদের শ্রদ্ধাভাজন হন।

(খ) সংঘর্ষের দিক ঃ [আকবরের সাম্রাজ্যবিস্তারের 'উত্তর ভারত বিজয়' দ্রষ্টব্য]।

*রাজপুত-নীতির **ফলাফল***

আকবরের রাজপুত-নীতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি মূলত সহযোগিতামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তবে মেবারের ক্ষেত্রে এই নীতির বিচ্যুতি ঘটেছিল, এর জন্য অবশ্য মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না, কেননা তিনি আকবরের সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অনেকে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষকে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের দৃষ্টান্ত বলেছেন অর্থাৎ রাণা প্রতাপ ছিলেন হিন্দু-স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক। কিন্তু এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা স্বাধীনচেতা প্রতাপ সিংহ অন্যান্য রাজপুত নেতাদের মতো মোগলদের আনুগত্য মেনে নেন নি। এই সংঘর্ষ ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। প্রসঙ্গত, আকবরের রাজপুত-নীতির সঙ্গে আফগান-নীতির মৌলিক প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। সমধর্মাবলম্বী আফগানদের সঙ্গে আকবর কোনরকম নমনীয় মনোভাব দেখান নি। বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার আফগান শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে তিনি তাদের দমন করেন। আকবর বুঝেছিলেন আফগানরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করবে, তাই তাদের রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করা প্রয়োজন। অন্যদিকে আকবর রাজপুতদের প্রতি তুলনামূলকভাবে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন। তাদের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেন এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপুতদের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

হিন্দুদের সন্তোষবিধানের জন্য আকবর রাজপুতদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা করতেন এবং হিন্দুসমাজে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। এর ফলে আকবর হিন্দুদের আস্থাভাজন হন। হিন্দু তথা রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বন্ধুত্বমূলক মনোভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। একথা সত্য যে, পূর্ববর্তী তুর্কীদের মত আকবর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও গৌরবের জন্য স্থানীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি একের পর এক ধ্বংস করেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের সঙ্গে আকবরের নীতির পার্থক্য হল এই যে, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে স্থানীয় স্বাধীন রাজন্যবর্গের অনেককে তৈমুর বংশের অনুগত মিত্রে পরিণত করেন। উদারনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি হিন্দু বিধর্মী হিসেবে রাজপুতদের ওপর কখনও অত্যাচার করেন নি। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সঙ্গে রাজপুতদের সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা স্বীকার করে আকবর রাজপুতদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। এখানেই আকবরের রাজপুত-নীতির সাফল্য ও যৌক্তিকতা। বন্ধুত্বমূলক নীতির মাধ্যমে আকবর রাজপুতদের বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সমর্থ হন। রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যশাসন ব্যাপারে মোগল-সম্রাটরা রাজপুতদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের মূলে ছিল রাজপুতদের সক্রিয় সহযোগিতা। সম্রাটদের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাজপুতরাই ছিলেন প্রধান অবলম্বন। রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে

বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহের সঙ্গে টোডরমলও গেছিলেন (১৫৮৬ খ্রীঃ)।

মোগল যুগের প্রশাসনেও টোডরমল বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। গুজরাটের দেওয়ান হিসেবে তিনি জমি বিলির নতুন রীতির প্রবর্তন করেন ও রাজস্ব আদায়ের নীতি নির্ধারিত করেন। মুজফ্‌ফর খাঁ ভকিলের অধীনে টোডরমল রাজস্বমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বাংলার বিদ্রোহ দমনের পর তিনি ওয়াজীর পদে নিযুক্ত হন (১৫৮১ খ্রীঃ)। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চার-হাজারী মন্‌সবদার পদে উন্নীত হন। মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজস্বসচিব হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে তাঁর মৃত্যু হয়।

একমাত্র মেবারই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু অন্যান্য রাজপুত নৃপতিদের সাহায্যেই মোগল সম্রাট মেবারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করতে সমর্থ হন। আকবরের রাজপুত-নীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কর্তৃক এই নীতি পরিত্যক্ত হলে মোগল-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। রাজপুতদের সাহায্যে আকবর শুধু যে রাজ্যবিস্তার ও বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা নয়, তাঁদের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও শক্তিশালী করতেও সমর্থ হন। আকবরের আমলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে হিন্দু তথা রাজপুতদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

মোগলদের সঙ্গে মৈত্রী রাজপুতদেরও যোগ্যতা প্রমাণ করার ও পদোন্নতির সুযোগ এনে দেয়। অন্যত্র এই সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ছিল না। রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী মোগল রাজনীতির এক ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে গণ্য করা যায়। রাজপুতানায় শাসক সম্প্রদায়ের মর্যাদা লাভ করা ছাড়াও বহু রাজপুত জমিদার উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে ছিল। এই অবস্থায় বিশিষ্ট রাজাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেয়ে রাজপুতদের সঙ্গে এক সার্বিক মৈত্রী স্থাপনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। "হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র শাসকগোষ্ঠী সংগঠনের লক্ষ্যবস্তুর দিকে এই রাজপুত মৈত্রী একটি সুদূর-প্রসারী ও অর্থবহ পদক্ষেপ" (সতীশচন্দ্র)। সাম্প্রতিককালে গবেষক ইকতিদার আলম খান মনে করেন, আকবর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলেন—এর মূলে কোন ধর্মীয় অথবা মানসিক উদারতা ছিল না। তাঁর মতে আকবর ধারাবাহিকভাবে রাজপুতদের সঙ্গে নমনীয় নীতি অনুসরণ করেন নি। উজবেক বিদ্রোহ দমনের পর আকবর রাজপুত-নীতিতে কঠোরতা দেখান।

হিন্দুদের প্রতি আকবরের নীতি ঃ আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের প্রতি অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি। বহু শতাব্দী ধরে ভারতে হিন্দু নির্যাতন নীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু আকবর ছিলেন প্রকৃত সংগঠক। মোগল-সাম্রাজ্যের সাধারণ রাষ্ট্র-নীতিতে আকবরের হিন্দু-নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনে ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য হিন্দুদের সহযোগিতা যে প্রয়োজন, আকবর তা উপলব্ধি করেন। তুঘলক রাজত্বের শেষের দিকে হিন্দু-শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছিল এবং হিন্দুরা নিজেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছিল। প্রকৃতপক্ষে এমন এক সময় এল যখন হিন্দু-শক্তির কাছে মুসলিম-শক্তির পর্যুদস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে রাণা সংগ্রাম সিংহ ও হিমুর অভ্যুত্থান উল্লেখ করা যায়। উভয়ক্ষেত্রে মোগলরা কোনক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই অবস্থায় আকবরের পক্ষে এক বলিষ্ঠ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। আকবর স্পষ্টই উপলব্ধি করেন যে, ভারতে তৈমুর বংশের স্বার্থ এবং বৃহত্তর মুসলিম ও হিন্দু জনগণের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। ১৫৬২ থেকে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি থেকেই হিন্দুদের প্রতি তাঁর নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও হিন্দু রমণী বিবাহ করায় ও হিন্দু ধর্মাচার্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনার ফলে তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর ধর্মনীতি এবং হিন্দুনীতির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র ছিল একথা বলা যায়।

হিন্দুদের প্রতি উদারনীতির কারণ

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া-কর উঠিয়ে দেন। এর ফলে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করে।

জিজিয়া-কর রহিত

তীর্থ-কর রহিত, ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনতা, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, হিন্দু ক্রীতদাস-প্রথার অবসান

১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে তীর্থকর বাতিল করেন। মন্দির বা উপাসনাগৃহ নির্মাণ ও তীর্থগমনে যে সকল বাধানিষেধ হিন্দুদের ওপর এতদিন আরোপিত ছিল তা প্রত্যাহার করা হল। তিনি 'অনুবাদ বিভাগ' (Translation Department) নামে একটি বিভাগ স্থাপন করে হিন্দুধর্মীয় বইপত্র ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর একটি আইন প্রণয়ন করে হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রথা বন্ধ করেন।

উচ্চ রাজপদে হিন্দু নিয়োগ

প্রাক্-আকবর আমলে রাষ্ট্রের সকল উচ্চপদগুলি কেবল মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল এবং সকল প্রকার দায়িত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ পদগুলি থেকে হিন্দুরা বঞ্চিত ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি সরকারের সকল উচ্চপদগুলি হিন্দুদের কাছেও উন্মুক্ত করেন। টোডরমল, মানসিংহ, ভগবান দাস, রায়সিংহ প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পূর্বে হিন্দুদের বিচার মুসলমান কাজী নিষ্পন্ন করতেন। আকবর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে হিন্দুদের জন্য ব্রাহ্মণ বিচারকের ব্যবস্থা করেন।

সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধকরণের চেষ্টা

আকবর হিন্দুসমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ও অন্যান্য কু-প্রথাগুলি দূরীকরণের চেষ্টাও করেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ-প্রথা প্রচলিত করতেও যত্নবান হন।

আকবর হিন্দুদের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার এবং তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দান করে হিন্দু সমাজের অখণ্ড আনুগত্য ও সহযোগিতা লাভ করেন।

আকবর ও তাঁর পূর্বগামীরা

আকবরের শাসনব্যবস্থা ঃ আকবর উন্নত শাসনপদ্ধতি প্রচলন করে অসামান্য সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দেন। এইরূপ বলা হয়ে থাকে যে, তিনি শের শাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনপদ্ধতি অনুকরণ করেন। অপর দিকে আবুল ফজল শের শাহের কৃতিত্ব অস্বীকার করে বলেন যে, তিনি (শের শাহ্) 'তারিখে-ফিরোজশাহী'তে বর্ণিত আলাউদ্দিনের শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করেন। স্মিথ বলেছেন যে, ভারতে ইংরাজ শাসকরা বহু বিষয়ে আকবরের শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন শোর যখন জেলার সৃষ্টি করেন তখন তিনি আকবরের 'সরকার' নামক বিভাগটির অনুকরণ করেন। স্মরণ রাখা দরকার যে, 'প্রতিভাবান শাসকমাত্রই তাঁদের পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আকবরের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। শের শাহের রাজস্ব-ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মুদ্রা-নীতি আকবরকে বহুলাংশে সাহায্য করেছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আকবরের রাষ্ট্রীয়-নীতি ও শাসনপদ্ধতিতে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আকবরের শাসনব্যবস্থার মূল নীতি ছিল উদারতা, ধর্মসহিষ্ণুতা ও প্রচলিত রীতি-নীতির স্বীকৃতি।

আকবরের শাসনব্যবস্থার মূল-নীতি

শাসননীতির উদ্দেশ্য

কেন্দ্রীয় শাসন ঃ সম্রাট ঃ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিলেন সম্রাট নিজেই। তিনি ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছিলেন ধর্মগুরু। কিন্তু আকবর স্বেচ্ছাচারী হলেও দায়িত্ববোধশূন্য ছিলেন না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাবর্গের কল্যাণসাধন করাই তাঁর শাসননীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তিনি নিজেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। প্রতিদিন তিনবার রাজসভার অধিবেশন বসত। এর মধ্যে দুটি সভায় শাসনকার্য সম্পাদিত হত এবং তৃতীয় সভায় সাধারণ ধর্ম আলোচনা হত। একটি পৃথক দিনে বিচারসভা বসত। যুদ্ধযাত্রাকালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হত না।

কেন্দ্রীয় শাসন ঃ মন্ত্রীবর্গ ঃ শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নানান বিভাগ ছিল এবং কয়েকজন মন্ত্রীর ওপর এই সকল বিভাগের ভার ন্যস্ত থাকত। (১) সম্রাটের নীচেই ছিলেন ভকিল। তিনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাজকর্মচারীদের সর্বপ্রধান। তবে বৈরাম খাঁ-র মত ভকিল যাতে উদ্ধত বা সর্বশক্তিমান না হতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা হত। আকবরের অন্য চারজন মন্ত্রী ছিলেন। (২) 'দেওয়ান' বা ওয়াজির, রাজস্ব আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার দেওয়ানের ওপর ন্যস্ত থাকত। তিনি সম্রাটের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। (৩) 'মীর-বক্সী' ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বপ্রধান কর্মচারী। তিনি ছিলেন যুদ্ধসচিব (Secretary of War)। তিনি সামরিক কর্মচারী ও সৈনিকদের বেতন দিতেন এবং তাদের সুখ-সুবিধার ওপর নজর রাখতেন। (৪) 'মীর-সামান' ছিলেন সম্রাটের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনের নিমিত্ত রাজ-কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি বাদশাহী গার্হস্থ্য বিভাগেরও সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন। (৫) সদর-উস্-সুদুর ছিলেন ইসলাম ধর্মীয় বিষয় ও বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। আকবরের আমলে সদর-উস-সুদূরকে ভারতের সর্বোচ্চ বিচারপতি বলা যায়।

উল্লিখিত চারজন মন্ত্রীকে মোগল-সাম্রাজ্যের চারটি স্তম্ভরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে মোগল-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব এদের ওপর নির্ভর করত না। তাজমহলের স্তম্ভের মত এই মন্ত্রীবর্গ ছিলেন এই বিশাল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সৌন্দর্য বর্ধনকারী মাত্র।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় শাসনে অপর দুজন গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দারোগায়ে-গুসলখানা' এবং 'আরজে-মুকারর'। প্রথমোক্ত কর্মচারী সম্রাটের সেক্রেটারীর কাজ করতেন এবং শেষোক্ত কর্মচারী সম্রাটের পরওয়ানাগুলির পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করে সম্রাটের কাছে পুনরায় পেশ করতেন। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 'দারগায়ে-ডাকচৌকী' এবং 'মীর-আরজ' যথাক্রমে গুপ্তচর-বিভাগ ও প্রজাসাধারণের আবেদনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

রাজস্ব-নীতি ঃ আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে রাজস্ব-সংক্রান্ত বহুবিধ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু এতে কোনরূপ সুবিধা হয় নি। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমলের রাজস্ব-সংস্কারের পর মোটমুটিভাবে তিন ধরনের রাজস্বব্যবস্থা অনুসৃত হয়। টোডরমলের রাজস্ব-নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল—(১) আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ করা, (২) প্রত্যেক বিঘার উৎপন্ন শস্যের গড় নির্ণয় এবং (৩) প্রত্যেক বিঘার রাজস্বের হার নির্ধারণ।

তিনপ্রকার রাজস্ব-ব্যবস্থা

(১) গাল্লাবক্স ঃ এই নিয়ম অনুসারে শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হত। এই ব্যবস্থা সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর ও কাবুলের একাংশে প্রবর্তিত হয়েছিল।

সিন্ধু, কাশ্মীর ও কাবুলে প্রচলিত

(২) জাবৎ ঃ এই ব্যবস্থা অনুযায়ী শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হত। জমির উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন অনুসারে সকল চাষের জমি 'পোলজ' (যে জমি সমগ্র বছর চাষ হত), 'পরৌটি' (যে জমি বছরের কিছু সময় চাষের উপযোগী থাকত না), 'চাচর' (যে জমি তিন-চার বছরের জন্য পতিত রাখা হত) এবং 'বানজার' (যে জমি চার-পাঁচ বছরেরও অধিক পতিত রাখা হত) এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। উৎপাদন অনুসারে প্রথম তিন শ্রেণীর জমিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন পর্যায়ে ভাগ করে উৎপন্নের আনুমানিক গড়পড়তা হিসাব নির্ণয় করে শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর রূপে ধার্য করা হত। জমির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে এইরূপ ব্যবস্থাও স্থির করা হয়। কৃষকদের ভূমিজাত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অথবা তার নগদ মূল্য রাজস্ব হিসেবে দেওয়ার সুবিধাও দেওয়া হত। এইরূপ রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল 'রায়তওয়ারী'

গুজরাট, বিহার, মালব, মুলতান ও রাজপুতানায় প্রচলিত

অর্থাৎ রাজস্ব ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। "জাবৎ" ব্যবস্থা মুলতান, গুজরাট, বিহার, মালব ও রাজপুতানার কিছু অংশে প্রবর্তিত হয়েছিল।

কৃষকদের সুবিধা

এই ব্যবস্থায় কৃষকদের অনেক সুবিধা হয়েছিল। প্রথমত, সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় রাজস্ববিভাগের রাজকর্মচারীদের নির্যাতন থেকে তারা রক্ষা পায়। দ্বিতীয়ত, রাজস্বের পরিমাণ অতিরিক্ত মনে করলে তারা জমি জরিপ ও রাজস্বের হার পুনর্বিবেচনার জন্য সরাসরি সরকারের কাছে আবেদন করতে পারত। তৃতীয়ত, জলাভাব, বন্যা বা দুর্ভিক্ষের কারণে জমি চাষ বন্ধ থাকলে রাজস্ব মুকুব করা হত।

জমিদারী-প্রথার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বাংলাদেশে প্রচলিত

(৩) নসক্ ঃ এই ব্যবস্থা জমিদারী-প্রথার সমতুল ছিল। জমি জরিপ করে তার উৎপাদনী শক্তির অনুপাতে কর ধার্য করার পরিবর্তে একটি মোটামুটি অনুমানের (estimate) ওপর রাজস্ব স্থির করা হত। এই ব্যবস্থা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন, "বাংলাদেশে কৃষক ও সরকারের মধ্যে ফসল ভাগ করার প্রথা ছিল না। কৃষিজাত ফসল ছিল সস্তা এবং উৎপাদনের মোটামুটি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কর ধার্য করা হত।"

রাজস্ববিভাগের কর্মচারীবৃন্দ ঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য বহু কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। আকবর রাজধানীতে একজন প্রধান দেওয়ান ও প্রত্যেক সুবায় (প্রদেশ) একজন করে দেওয়ান নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। প্রত্যেক সরকারে একজন 'আমিন' থাকতেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিতিক্চি, পোদ্দার, কানুনগো, মুকাদ্দম ও পটোয়ারী প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন। আমিনকে বহু রকমের দায়িত্ব পালন করতে হত। তাঁকে বিদ্রোহী কৃষকদের মোকাবিলা করতে হত। কৃষি-জমির উৎকর্ষতার মান স্থির করতে হত এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কৃষকরা যাতে কোন রকমে উৎপীড়িত না হয় সেদিকে আমিনকেও লক্ষ্য দিতে হত। নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত আদায় নিষিদ্ধ ছিল। পটোয়ারী, মুকাদ্দম, কারকুন প্রভৃতি কর্মচারীদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমিনের। নিজ এলাকার অন্তর্গত কৃষি-সংক্রান্ত কোন জটিলতার উদ্ভব হলে সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করার দায়িত্ব ছিল আমিনের।

বিতিক্চি ছিলেন আমিনের সম-মর্যাদাপূর্ণ অপর কর্মচারী। তাঁর দায়িত্ব ছিল কানুনগোদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করা। দক্ষ হিসাবরক্ষককেই এই পদে নিযুক্ত করা হত। তাঁকে নিজ এলাকার প্রচলিত আইনকানুন সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হত। সরকারের সঙ্গে কৃষকদের বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগজপত্র সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল বিতিক্চির। নিজ এলাকার অন্তর্গত যাবতীয় আবাদী ও অনাবাদী জমি এবং ব্যয়ের হিসাব রাখার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল।

পোদ্দার বা খাজিনদাররা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে রসিদ দিতে বাধ্য থাকত। পরগনার রাজস্ব-কর্মচারী ছিলেন কানুনগো। তাঁকে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের জমি-জায়গা ও তাদের দেয় খাজনার হিসাব রাখতে হত।

কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগনা গঠিত ছিল। প্রতিটি গ্রামের কর্মচারী ছিলেন মুকাদ্দম ও পটোয়ারী। মুকাদ্দমের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করা। কর্মচারীরা যাতে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতে না পারে এবং দুঃসময়ে যাতে কৃষকরা ঋণ পেতে পারে, সেজন্য আকবরের কঠোর নির্দেশ ছিল।

রাজস্ব-নীতির গুরুত্ব ঃ আকবরের রাজস্ব-নীতি এবং কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি ঘটে। রাজকর সুনির্দিষ্ট হওয়ায় অন্যায়ভাবে কর আদায়ের কোন অবকাশ ছিল না। জমির ওপর কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় অন্যায়ভাবে তাদের জমিচ্যুত করার কোন অবকাশ ছিল না। কৃষির উন্নতি হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য দ্রব্যাদির মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ্রাস পায়।

অন্যদিকে সম্রাটের আয় অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব সুনির্দিষ্ট হওয়ায় রাজকর্মচারীদের পক্ষে তা আত্মসাৎ করার কোন উপায় ছিল না। দুর্ভিক্ষ বা অজন্মার সময় কর মাপ করার ও কৃষকদের অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। স্মিথ আকবরের রাজস্ব-নীতির প্রশংসা করে লিখেছেন যে, সম্রাটের রাজস্ব-নীতি ছিল বাস্তববাদী ও সুচিন্তিত। তিনি আকবরের প্রজাকল্যাণমূলক আদর্শের প্রশংসা করেও ইংরাজদের রাজস্ব-নীতির তুলনায় এর মান যে উন্নত ছিল, এমন কথা অবশ্য স্বীকার করেন নি। স্মিথের মতে দুর প্রদেশের শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা আকবরের রাজস্ব-নীতির মৌল আদর্শ ব্যর্থ করে দেয়। অবশ্য এই অভিমতের সমর্থনে স্মিথ নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দেন নি। একথা সত্য যে, পূর্ববর্তী মুসলমান শাসনকালে রাজস্বের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আকবরের রাজস্বব্যবস্থা তার অবসান ঘটিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয় এবং জনসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীদের দুর্নীতি যথাসম্ভব দমন করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মচারীদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের রীতি প্রবর্তিত হয়।

সুনির্দিষ্ট রাজস্ব, কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি ও জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাস

আকবরের রাজস্ব-নীতি সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, কৃষক ও সরকারের মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হত। তহসিলদার ও কৃষকের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকত। এর একটি কারণ হল সুদূর দিল্লীর রাজকোষের জন্য কৃষকদের খাজনা দিতে হত, অথচ এর বিনিময়ে তারা কোন সুযোগ-সুবিধা পেত না।

সরকারের মন্তব্য

আকবর ও অভিজাতশ্রেণী ঃ মোগল প্রশাসনের সামাজিক ভিত্তি ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। বাবরের সময় থেকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত সংগঠনও স্ফীত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে ভারতে অভিজাত ও ভূ-স্বামী বা জমিদারদের নিয়েই গঠিত ছিল শাসকশ্রেণী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে মোগল অভিজাতশ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। তত্ত্বগতভাবে সকলের কাছে মোগল অভিজাতদের দরজা খোলা ছিল। কিন্তু বাস্তবে অভিজাতদের নিয়োগের সময় তাদের বংশগত কৌলিন্যের দাবি সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হত। 'খানাজাদ' অর্থাৎ মন্‌সবদারদের পুত্র ও বংশধরদের দাবি ছিল সর্বাগ্রণ্য। এর পরে স্থান ছিল জমিদার ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য প্রধান ব্যক্তি বা নায়কদের। আকবর এক বিরাট সংখ্যক জমিদার ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে অভিজাতের মর্যাদা দান করেন। এই জমিদারদের পূর্বপুরুষাগত জমিদারিকে 'ওয়াতন-জায়গির' বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু সরকারী কর্মচারী হিসেবে তাঁদের মধ্যে সাধারণ জায়গিরও বিতরণ করা হত। অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল অন্যান্য রাজ্যের প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ অভিজাত ও উচ্চপদাধিকারী কর্মচারীরা। এই প্রসঙ্গে বাসরার তুর্কী শাসনকর্তা হুসেন পাশা-র নাম উল্লেখ করা যায়। সামরিক কারণে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের সুদক্ষ সেনাপতি বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ প্রলুব্ধ হয়ে মোগল অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বংশগত বা জন্মগত কৌলিন্য না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু অভিজ্ঞ প্রশাসক বা হিসাবরক্ষক (accountants)-দেরও মোগল অভিজাতের মর্যাদা দেওয়া হত। সাধারণত এদের নিম্নমানের পদ-মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ সাম্রাজ্যের প্রশাসনের উচ্চপদেও উন্নীত হন। এই প্রসঙ্গে রাজা টোডরমলের নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া জ্ঞানীগুণী ও ধর্মীয় নেতাদেরও অভিজাতশ্রেণীভুক্ত করা হত। এই প্রসঙ্গে আবুল ফজল ও শাহজাহানের সময় দানিশ মন্দের নাম উল্লেখ করা যায়।

অভিজাতশ্রেণীর সংগঠন

সুতরাং দেখা যায় যে, বংশগত ও জন্মগত কৌলিন্য ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে মোগল অভিজাতশ্রেণী সংগঠিত ছিল।

তত্ত্বগতভাবে মোগল অভিজাতশ্রেণীর স্রষ্টা ছিলেন সম্রাট। তিনিই যে কোন ব্যক্তিকে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত করে তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি বা ক্ষুণ্ণ করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। সেই

সঙ্গে একথা মনে করলে ভুল হবে যে যোগ্যতা বা বংশগত কৌলিন্য থাকলেও বা সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করার মত যোগ্যতা থাকলেও যে কেউ এই শ্রেণীভুক্ত হতে পারত না। মনসবদাররা শুধু যে সরকারী কর্মচারীই ছিলেন এমন নয়, তাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যের বিত্তশালী ও সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অনেক সময় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পদমর্যাদা লাভ করা সম্ভব ছিল না।* অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না। আকবরের আমলের পূর্বে অভিজাত সমাজের কোনও সঠিক সংগঠন ছিল না। সুলতানি আমলের ভৌমিক অভিজাত বা ভূস্বামীরা এই তালিকা থেকে বাদ পড়েন। সুতরাং অভিজাত সমাজে হিন্দুদের কোন স্থান ছিল না। হুমায়ুন অভিজাতদের একটি ব্যাপক শ্রেণীবিভাগ করেন। তিনি সভাসদ্‌দের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি শ্রেণীকে বারোটি স্তরে বিন্যস্ত করেন। "এইভাবে প্রতি শ্রেণীর মধ্যে একটি অগ্রাধিকারের ক্রম নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু এই অগ্রাধিকারের ক্রম কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং বিভিন্ন ক্রমের সঙ্গে বিশেষ মর্যাদা জড়িত ছিল কিনা সেকথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না।†

সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল সমর বাহিনী। কাজে কাজেই আকবর এই ভিত্তিকে গতিশীল ও সুসংবদ্ধ করতে চাইলেন। অবশ্য পারস্যের আবাসিদ বংশের রীতি এবং চেঙ্গিজ খাঁ ও তৈমুর লঙ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির ধাঁচে আকবর মনসবদারী-প্রথা প্রবর্তন করেন। পোষণীয় অশ্বারোহীর সংখ্যার ভিত্তিতে তিনি অভিজাত সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেন। সমস্ত ব্যবস্থাটির মূল ভিত্তি ছিল প্রতিটি মনসবের ও প্রতি সংখ্যক সেনার একটি নির্দিষ্ট বেতন নির্ধারণ। এই বেতন থেকে পদাধিকারীকে তার ব্যক্তিগত ব্যয় ও সেনার ব্যয় নির্বাহ করতে হত। এই বেতন নগদে বা জায়গিরে দেওয়া হত। আকবর অভিজাতশ্রেণীকে রাজশক্তির বেতনভোগী ভৃত্যে পরিণত করেন। ফলে অভিজাতশ্রেণীকে আমলাতন্ত্রীকরণের একটি পদক্ষেপ বলা যায়। বাবর ও হুমায়ুন জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভেদমূলক নীতি কখনও অনুসরণ করেন নি। তাঁদের আমলের অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইরানী, তুরানী, উজবেগ, আফগান ও এমন কি রাজপুত প্রভৃতি জাতি। ভারতীয় ইসলামধর্মী অভিজাতশ্রেণী অথবা মুসলমান ধর্মান্তরিত ভারতীয়রা সম্ভবত প্রথম থেকেই মোগল দরবারে স্থান লাভ করেছিল। প্রথমদিকে তৈমুর বংশের প্রতি অভিজাতদের বিশেষ আনুগত্য ছিল না। এদের অনেকেই ছিল উচ্চাভিলাষী এবং সময় সময় বিদ্রোহ করতেও দ্বিধাবোধ করত না। আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে বিভিন্ন সংগঠিত জাতিগোষ্ঠী মোগল অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবর এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি স্থাপন করে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করতে প্রয়াসী হন। "আকবরের প্রগাঢ় মানবতাবোধ এবং মহানুভবতা, উচ্চ আদর্শ এবং ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি এবং সর্বোপরি যুদ্ধক্ষেত্রে তার অব্যর্থ সাফল্য ক্রমে ক্রমে অভিজাতশ্রেণীর অনুরাগ ও আনুগত্য অর্জন করেছিল এবং একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল।** কিন্তু আকবর এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মনসবদারী-প্রথার মাধ্যমে অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একটি সুদক্ষ ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ারে পরিণত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্রাটের নেতৃত্বে এমনভাবে সংগঠিত করা যাতে সম্রাটকে কোনও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়। পূর্বতন অভিজাতদের আনুগত্যে আকবর আস্থাশীল ছিলেন না। এই কারণে তিনি তাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হন। এই মিত্রতা রাজপুতদেরও পদোন্নতির সুযোগ দেয়।

---

* *আথার আলি—The Mughal Nobility under Aurangzeb পৃষ্ঠা ১১-১৪।*

† *সতীশচন্দ্র—মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি—পৃঃ ১৪।*

** *সতীশচন্দ্র—মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি—পৃঃ ১৬।*

তিনি একজন **উর্ধ্বতন** রাজকর্মচারীর অধীনে অভিজাতদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কর্মরত রাখতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি প্রতিটি গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতেও সচেষ্ট ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই রাজপুত-মৈত্রী রক্ষা করে চলেন। সুতরাং রাজপুত-মৈত্রী মোগল রাজনীতির এক ভিত্তিপ্রস্তর বলে গণ্য করা যায়। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়কে নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র শাসকগোষ্ঠীর সংগঠনের লক্ষ্যবস্তুর দিক দিয়ে রাজপুতদের মিত্রতার গুরুত্ব মোগল সম্রাটরা উপলব্ধি করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে অভিজাত-সংগঠন অনেকটা স্থিতিশীলতা লাভ করে। এই দুই সম্রাট অভিজাত-সংগঠন তথা মন্‌সবদারী-প্রথা, সুশৃঙ্খলভাবে অভিজাত তথা মন্‌সবদারদের পদোন্নতি, রাজকীয় চাকুরীতে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট মনসংযোগ করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলের অভিজাতদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। তাঁদের আমলে হিন্দুদের মধ্যে যারা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হয় তারা ছিল মারাঠা। দাক্ষিণাত্যে শক্তির উৎস হিসেবে মারাঠাদের গুরুত্ব সর্বপ্রথম জাহাঙ্গীরই অনুধাবন করেন এবং এই কারণে তিনি তাদের সমর্থন লাভে সচেষ্ট হন। শাহজাহানও এই নীতি অনুসরণ করে চলেন। ঔরঙ্গজেবও দাক্ষিণাত্যের মুসলমান ও মারাঠাদের রাজকীয় চাকুরীতে নিয়োগ করতে দ্বিধা করেন নি।

মোগল সম্রাটদের প্রশাসনিক দক্ষতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় মুগ্ধ হয়ে বহু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি বিভিন্ন দেশ থেকে মোগল দরবারে আসতে থাকে। এদের অধিকাংশই এসেছিল ইরান, তুরান, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ থেকে। এই নবাগতদের মধ্যে কিছু অসাধারণ ব্যক্তি নিজ নিজ যোগ্যতাবলে মোগল প্রশাসনের উচ্চতম পদ অর্জন করেন। অবশ্য প্রশাসনকার্যে এই সকল নবাগতদের পদমর্যাদার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন নয়। ভারতীয় মুসলমান ও রাজপুতদেরও এইরূপ মর্যাদা দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতাই ছিল পদোন্নতির মাপকাঠি, যদিও সম্রাটদের সঙ্গে অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও একটি ভূমিকা ছিল। বহিরাগতরা মোগল দরবারে প্রচলিত ভাষা ও আচার-আচরণ গ্রহণ করে। সকল মোগল অভিজাতকে এবং সুযোগ্য বহিরাগতকে যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হলেও তাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে মোগল সম্রাটরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল, যদিও হিন্দু অভিজাতরা সাধারণভাবে জাতিভেদের নিয়মকানুন ও আচার-অনুষ্ঠান কঠোরভাবে মেনে চলতেন।

অভিজাত সংস্থার গুরুত্ব

কতকগুলি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মোগল অভিজাতশ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল সন্দেহ নেই। সতীশচন্দ্রের মতে "বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসমঞ্জস্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য...দেশে সার্ধশত বছরের বেশী সময় অভাবনীয় ঐক্য ও সুশাসন স্থাপনের কাজে এটি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই।*

মন্‌সবদারী-প্রথা ঃ আকবরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মন্‌সবদারী-প্রথার প্রচলন। আকবর শের শাহের মত জায়গির-প্রথার বিরোধী ছিলেন। মোগল রাজত্বকালে সামরিক ও বে-সামরিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত মন্‌সবদারী-প্রথা। পারস্যদেশে এই প্রথা বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল এবং আকবর তা অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। মোগল প্রশাসনিক সংগঠন ছিল মূলত সামরিক ধাঁচের এবং এর প্রধান ভিত্তি ছিল সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। আকবরের পূর্বে মোগল রাজকর্মচারীদের সংগঠিত করার

---

* *সতীশচন্দ্র—মোগল দরবারে দল ও রাজনীতি—পৃঃ ২৩।*

বিশেষ কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। হুমায়ুন তাঁর কর্মচারী তথা সমগ্র জনগণকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা—'অহল-ই-দৌলত' (বিত্তশালীরা), 'অহল-ই-সাদাৎ' (সাধু-সন্ত ও পণ্ডিতরা) এবং 'অহল-ই-মুরাদ' (সাধারণ মানুষ)। এইভাবে সমগ্র সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের 'অহল-ই-দৌলত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম আকবরই মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তন করে সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত করতে প্রয়াসী হন। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সুলতানি আমলে সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের 'দেওয়ান-ই-আর্জ' বিভাগ থেকে বেতন দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। বারণীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিনের সভাকবিরা 'দেওয়ান-ই-আর্জ' থেকে বেতন পেতেন। কিন্তু সামরিক বিভাগ থেকে বেতন পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যে আলাউদ্দিনের যুদ্ধবিগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন এমন কোন নজীর নেই।**

সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত করা ছাড়াও, মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তন করার মূলে আরও একটি কারণ ছিল—প্রচলিত জায়গির-প্রথার কুফল। প্রাক্-আকবর যুগে উচ্চপদস্থ সামরিক ও বে-সামরিক রাজকর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির দেওয়া হত। কর্মচারী ও অভিজাতরা যুদ্ধের সময় সম্রাটকে সেনা জোগান দিয়ে বা অন্য কোনভাবে সাহায্য করার বিনিময়ে জায়গির ভোগ করতেন। কিন্তু কালক্রমে জায়গির-প্রথা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ দুর্নীতিগ্রস্ত জায়গিরদারদের ওপর সম্রাটকে নির্ভর করতে হত। এই কারণে আলাউদ্দিন খাল্‌জী নগদ বেতনে সম্রাট-নিয়ন্ত্রিত এক কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং অধিকাংশ জায়গির বাজেয়াপ্ত করে নেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় জায়গির-প্রথা চালু হয়। যথেচ্ছ জায়গির বিতরণের ফলে খালিসাজমি ক্রমেই জায়গিরদারদের হাতে চলে যায়, ভূমি-রাজস্ব খাতে সরকারী আয় হ্রাস পায়। তাছাড়া সুলতানি আমলের শেষের দিকে জায়গির-প্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ায়, জায়গিরদাররা রাষ্ট্রের সেবা করার পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী হয় এবং রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে তা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই সকল কারণে আকবর জায়গির-প্রথা যথাসম্ভব খর্ব করে সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন।

'মন্‌সব' কথাটির অর্থ হল পদমর্যাদা। আরভিন্ (Irvine)-এর মতে এই প্রথার লক্ষ্য ছিল বেতন অনুযায়ী কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা। ভারতে মোগলদের শাসনাধীনে 'মন্‌সব' কথাটির অর্থ হয় দায়িত্ব বা কর্তব্য। কিন্তু মন্‌সবদারী-প্রথার সংগঠন ও প্রসারের ক্ষেত্রেই দুটি সমস্যা প্রথম থেকেই ছিল। প্রথমত, এই প্রথার অন্তর্গত সকল পদাধিকার ব্যক্তির ক্ষেত্রেই 'মন্‌সব' কথাটি ব্যবহৃত হত না। শুধুমাত্র উচ্চ পদাধিকারীদের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করা হত যদিও প্রশাসনের সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রযোজ্য। কুরেশী (Qureshy)-র মতে দ্বিতীয় সমস্যা ছিল এই যে, সামরিক অর্থেই 'মন্‌সব' কথাটি ব্যাখ্যা করা হত, যদিও এই ব্যাখ্যা ছিল নেহাৎই অলীক বা প্রতীক মাত্র।† 'মন্‌সব' কথাটি ছিল অলীক—কারণ সকল কর্মচারীকে সামরিক পদমর্যাদা দেওয়া হলেও সকলের ক্ষেত্রে সামরিক দায়িত্ব পালন করা সদাসর্বদা বাধ্যতামূলক ছিল না।‡ তথাপি একথা সত্য যে, মন্‌সবদারী-প্রথার আওতায় প্রতিটি কর্মচারিরই কিছু না কিছু সামরিক দায়-দায়িত্ব ছিল।

'মন্‌সব' কথাটির ব্যাখ্যা

* *অনিরুদ্ধ রায়—Some aspects of Mughal Administration—পৃঃ ২০৯।*

** *ঐ।*

† *কুরেশী—"The mansab was defined in military terms, though the military definition was only a myth or at best a symbol"—Administration of the Mughals—পৃঃ ৮৯।*

‡ *অনিরুদ্ধ রায়—"It was a myth because all officers were given military ranks although no military obligation was a necessary for him.—উল্লিখিত গ্রন্থ—পৃঃ ২০৮।*

এ. জে. কাইজার-এর মতে আকবরই প্রথম মন্‌সবদারী-প্রথার প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বছরে (১৫৭৩-৭৪ খ্রীঃ) এবং প্রথম থেকেই এই প্রথায় 'জাত' ও 'সওয়ার'—এই দুই পদের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে মন্‌সবদারী-প্রথার বিবর্তনের কতকগুলি ক্রমপর্যায় দেখা যায়। শিরিণ মুসভি-র মতে আকবরের সিংহাসনের আরোহণের পূর্বে অথবা তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দশ বছরে রাজকর্মচারীদের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট সামরিক দায়-দায়িত্ব ছিল না এবং কর্মচারীদের বেতন যথেচ্ছভাবে নির্ধারণ করা হত। দ্বিতীয়ত, একাদশ বছরে (১৫৬৬-৬৭ খ্রীঃ) আকবর রাজকর্মচারীদের ওপর কিছু নির্দিষ্ট সামরিক দায়িত্ব ন্যস্ত করতে প্রয়াসী হন এবং জায়গিরের রাজস্বের অনুপাতে কিছুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত মোতায়েনের জন্য বাধ্য করেন। তৃতীয়ত, অষ্টাদশ বছরে (১৫৭৩-৭৪ খ্রীঃ) মন্‌সবদারী-প্রথা প্রবর্তন করা হয় এবং একটিমাত্র সংখ্যাসূচক পদ ধার্য করা হয়। এই সংখ্যা অনুসারে অশ্ব ও অশ্বারোহী বা সওয়ার রাখা কর্মচারীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়। অবশ্য বাস্তবে সামান্য সংখ্যক কর্মচারীই এই দায়িত্ব পালন করতেন। এই কারণে আকবর তাঁর রাজত্বকালের চল্লিশতম বছরে (১৫৯৫-৯৬ খ্রীঃ) মন্‌সবদারদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে পদ অনুযায়ী তাদের সওয়ারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেন। এই সময় থেকেই 'সওয়ার' পদের গুরুত্ব দেখা দেয় এবং ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই মন্‌সবদারী-প্রথায় 'জাত' ও 'সওয়ার' এই দ্বৈতপদ সুনির্দিষ্ট হয়। এই দ্বৈতপদের ভিত্তির ওপর মন্‌সবদারদের পাওনাগণ্ডার হিসাব স্থির করা হত। 'জাত'-পদের দ্বারা মন্‌সবদারদের ব্যক্তিগত বেতনের পরিমাণ স্থির করা হত। 'সওয়ার'-পদের সংখ্যা দ্বারা সৈন্যসামন্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি পরিমাণ অর্থ তারা সরকারী কোষাগার থেকে পাবেন তা স্থির করা হত। মোরল্যাণ্ড (Moreland)-এর মতে সওয়ার-পদের প্রাপ্য একটি নির্দিষ্ট হারে স্থির করা হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এক জটিল হিসাবনিকাশের পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হত।* 'সওয়ার'-পদ ছিল তিন ধরনের, যথা—'ইয়াক-আস্‌পা' বা এক ঘোড়ার সওয়ারি, 'দু-আস্‌পা' বা দুই ঘোড়ার সওয়ারি ও 'শি-আস্‌পা' বা তিন ঘোড়ার সওয়ারি। স্বভাবতই এদের পাওনার মধ্যে তারতম্য ছিল।

মন্‌সবদারী-প্রথার বিবর্তন

মন্‌সবদারদের কেউ কেউ নগদে বেতন পেতেন এবং এজন্য এদের বলা হত 'মন্‌সবদার-ই-নগদি'। অন্যান্য মন্‌সবদারদের নির্দিষ্ট পরিমাণে জমি জায়গির হিসেবে দেওয়া হত যদিও এই জায়গিরের ওপর মন্‌সবদারদের ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বীকৃত হত না। এই ধরনের জায়গিরকে বলা হত 'তন্‌খাজায়গির'। এছাড়া মন্‌সবদার-পদে নিযুক্ত সামন্ত-নৃপতিরা বংশানুক্রমিকভাবে জায়গির ভোগ করতেন, যাকে বলা হত 'ওয়াতনজায়গির'। ওয়াতনজায়গিরের রাজস্ব সামন্ত-নৃপতি ও জমিদাররাই নির্ধারণ করতেন। এই ক্ষেত্রে মোগল সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

সাধারণভাবে সম্রাট নিজেই মন্‌সবদার নিয়োগের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং সম্রাটের সামনে পদপ্রার্থীদের উপস্থিতি আবশ্যিক ছিল। পদপ্রার্থীদের সম্রাটের সামনে উপস্থিত করার দায়িত্ব ছিল 'মীর বক্‌সী'র। মন্‌সবদার নিয়োগের অপর পন্থা ছিল সুপারিশ অর্থাৎ সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অভিজাত, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও মোগল রাজকুমারদের সুপারিশ অনুসারে অনেক সময় মন্‌সবদার নিয়োগ করা হত। মন্‌সবদারদের নিয়োগ সম্রাটের অনুমোদন পাওয়ার পর তা নথিবদ্ধ করার জন্য দেওয়ান,

মন্‌সবদার নিয়োগ প্রথা ঃ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা—পৃঃ ১২।

বক্সী ও সামরিক হিসাব রক্ষকদের কাছে পাঠানো হত। নিয়োগপত্রগুলি নথিবদ্ধ হবার পর সেগুলি পুনরায় দ্বিতীয়বার অনুমোদনের জন্য সম্রাটের কাছে উপস্থাপিত করা হত ও সম্রাট তা অনুমোদন করতেন। উজীরের সীলকরা নিয়োগপত্রগুলি ফরমান হিসেবে অনুমোদিত মন্‌সবদারের কাছে পাঠান হত।

মন্‌সবদার-পদের প্রতিটি প্রার্থীর পক্ষে জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। মানুচি (Manucci)-র মতে সৈনিকদের পক্ষেও জামিন দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণত মহাজনরাই জামিনদার হত।

'দাঘ' ও 'চেহ্‌রা'

মন্‌সবদাররা নির্দিষ্ট অশ্ব ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখতে বাধ্য হবেন এই প্রত্যাশায় আকবর 'জাত ও সওয়ার' পদের সৃষ্টি করেন। কিন্তু মন্‌সবদাররা এই নিয়ম মেনে চলতেন না। সুতরাং তা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আকবর দাঘ বা চিহ্নিতকরণ (branding) ও 'চেহ্‌রা' বা বিবরণাত্মক তালিকা (descriptive roll) প্রথা চালু করেন।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চিহ্নিতকরণ (branding) রীতি আদৌ অভিনব ছিল না। আলাউদ্দিন খাল্‌জী ও শের শাহ্‌ এই রীতি অর্থাৎ অশ্বের ওপর চিহ্নিতকরণ ইতিপূর্বেই প্রয়োগ করেছিলেন। আকবর এই রীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই রীতি বহাল থাকে এবং সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই এই রীতির অবসান হয়।

মন্‌সবদাররা তেত্রিশটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন এবং এই শ্রেণীবিভাগ সেনা সংখ্যার ভিত্তিতেই করা হত। সর্বনিম্ন মন্‌সবদারের অধীনে ১০ জন সেনা এবং সর্বোচ্চ মন্‌সবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সেনা থাকত। দশ-হাজারী, আট-হাজারী ও সাত-হাজারী মন্‌সব সাধারণত রাজকুমারদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকত।

মন্‌সবদারদের শ্রেণীবিভাগ

পাঁচ শত 'জাত'-এর নিম্ন পদাধিকারকে বলা হত 'মন্‌সবদার'; পাঁচশো থেকে দুহাজার পাঁচশোর নিম্ন পদাধিকারকে বলা হত 'আমীর' এবং এর ঊর্ধ্বতন পদাধিকারকে বলা হত 'আমীর-ই-উম্‌দী'। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর পদাধিকারদের সকলকেই সাধারণভাবে 'মন্‌সবদার' বলা হত। মন্‌সবদারদের এই শ্রেণী বিভাগের কঠোরতা ছিল না। যে কেউ যোগ্যতা ও সম্রাটের অনুগ্রহে নিম্ন পদ-মর্যাদা থেকে উচ্চ পদ-মর্যাদায় উন্নীত হতে পারত। এইভাবে ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর পদোন্নতি নির্ভরশীল ছিল।

মন্‌সবদারদের যুদ্ধের সময় সম্রাটের সঙ্গে সসৈন্যে যোগদান করতে হত। সামরিক কর্তব্য ভিন্ন বে-সামরিক কর্তব্যপালনেও তাঁরা বাধ্য থাকতেন। মন্‌সবদারী পদমর্যাদা ব্যক্তিগত ও সম্রাটের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তা প্রদত্ত হত না।

বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে মন্‌সবদারী-প্রথা গড়ে ওঠে এবং এক বিশেষ প্রশাসনিক সংস্থার রূপ পরিগ্রহ করে। যখনই কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী প্রভৃত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত, তখনই তাদের নেতাদের উচ্চ মন্‌সব দিয়ে মোগল প্রশাসনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হত। বিভিন্ন ধরনের মানুষদের রাজপদে নিয়োগ করার ফলে মোগল মন্‌সবদারদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়, যেমন—তুরানি, ইরানি, আফগান, শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমান, রাজপুত, দক্ষিণী, মারাঠী ও অন্যান্য হিন্দু। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আকবর বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতেন যে তাঁকে বিশেষ কোন গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর ওপর নির্ভর করতে না হয়।

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পুত্র ও আত্মীয়ব্যতীত মন্‌সবদারদের জাতিগত বিন্যাস পরিবেশিত হল—

	মোট সংখ্যা	হিন্দু	ইরানী
৫০০০ ও তদূর্ধ্ব	৮	১	৪
৩০০০ - ৪০০০	১৩	৩	৫
১০০০ - ২৫০০	৩৭	৬	৬
৫০০ - ৯০০	৬৩	১২	১২
২০০ - ৪৫০	১৫৯	২৪	৪৫
	২৮০	৪৬	৭২

মোগল মন্‌সবদারদের প্রচুর বেতন দেওয়া হত। একশো 'জাত' পদাধিকারী মন্‌সবদারদের বেতন ছিল মাসিক ৫০০ টাকা ; এক হাজার পদাধিকারী মন্‌সবদারের বেতন ছিল ৪৪০০ টাকা এবং পাঁচ হাজারী মন্‌সবদারের বেতন ছিল মাসিক ৩০,০০০ টাকা।

'দাখিলী' ও 'আহদী'

মন্‌সবদার ভিন্ন 'দাখিলী' (Dakhili) এবং 'আহদী' (Ahadi) নামে অন্য দুধরনের সেনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দাখিলী' সেনাবাহিনীর পরিচালনার ভার মন্‌সবদারদের ওপর ন্যস্ত থাকত, তবে তাঁরা রাজকোষ থেকে বেতন পেতেন। 'আহদী'দের পরিচালনার ভার আমীরদের হস্তে ন্যস্ত থাকত এবং তাঁরা উচ্চহারে বেতন পেতেন।

মন্‌সবদার ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। এই দিক দিয়ে পূর্বতন সামরিক-প্রথার তুলনায় অধিকতর উন্নত। আবুল ফজল লিখেছেন যে, জাতিগত সম্পর্ক সেনাবাহিনীর প্রতিটি মানুষকে নেতার প্রতি অনুগত রাখত এবং মন্‌সবদারী-প্রথার ফলে সেনা নিয়োগ করার বিশাল দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ না করে মোগল সম্রাট এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন। উপরন্তু মধ্য-এশিয়ার ভাগ্যান্বেষী মোঙ্গল ও উজবেক এবং বিক্ষুব্ধ আফগানদের বিরুদ্ধে রাজপুত মন্‌সবদাররা সমভার রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া একমাত্র সম্রাটের প্রতি মন্‌সবদারদের আনুগত্য থাকায় মন্‌সবদারী-প্রথা ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠেছিল যা সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। একথা সত্য যে, মন্‌সবদারদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখে আকবর সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষেত্রে এই প্রথার কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আকবরের আমলে মোগলবাহিনীর দক্ষতা ও শৃঙ্খলার কথা বিদেশী পর্যটকরা উল্লেখ করেছেন। সামরিক সংস্থার সংগঠন, সরঞ্জাম ও শৃঙ্খলার প্রতি আকবরের সজাগ দৃষ্টি ছিল। মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকায় তিনি দক্ষতা, সাহসিকতা ও আনুগত্যের ভিত্তির ওপর মন্‌সবদার নিয়োগ করতেন। তিনি মন্‌সবদারী-প্রথাকে এমন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন যে সারা জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অপরাজেয় ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর আমলে এই প্রথার চরম সাফল্যের পরিচয়।

মন্‌সবদারী-প্রথা ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে এই ত্রুটিগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকরও ছিল না।* কিছুকাল চালু থাকার পর সামরিক যন্ত্র হিসেবে মন্‌সবদারী-প্রথার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রশাসনিক সকল বিভাগকে একক কেন্দ্রীয় যন্ত্রে পরিণত করার ফলে মন্‌সবদারী-প্রথা বা সংগঠনের দক্ষতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিক রীতি-নীতি সামরিক বিভাগে প্রবেশ করার ফলে এর দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রীতা মন্‌সবদারী-প্রথা তথা সামরিক শক্তিকে যথেষ্ট জটিল করে ফেলে। সেনার জন্য মোগল প্রশাসকরা মন্‌সবদারদের ওপরই অধিক নির্ভরশীল

* *কুরেশী—Administration of the Mughals—পৃঃ ১১২।*

থাকতেন এবং এই বিশাল সংস্থার সুপরিচালন নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাটদের ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব ঘটলে মনসবদারী-প্রথা প্রায় ভেঙে পড়ে। প্রতিটি মনসবদার সেনা পরিচালনায় দক্ষ—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্‌দের (theologians) সমরনায়ক নিযুক্ত করে সম্রাটরা মারাত্মক ভুল করেছিলেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রণাঙ্গনে মনসবদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও ঈর্ষা প্রভৃতি কারণে অনেক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পরিচালন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। এই প্রসঙ্গে কারনালের রণক্ষেত্রে মনসবদারদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণাম উল্লেখ করা যায়।* এই প্রথার অপর অন্যতম ত্রুটি ছিল দুর্নীতির প্রতি আকর্ষণ। ঐতিহাসিক আরভিন্ (Irvine) লিখেছেন যে, মনসবদাররা তাঁদের নিজ নিজ সৈনিকের সংখ্যার কারচুপি করতেন বলে মোগলবাহিনীর ভিত্তি বরাবরই দুর্বল ছিল। মনসবদাররা একে অপরকে সেনা ধার দিয়ে পরস্পরের নির্দিষ্ট সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করতেন এবং অনেক সময় কর্মহীন বেকারদের সামরিক পোশাকে সজ্জিত করে সুদক্ষ সেনা হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই সকল দুর্নীতি দূর করার জন্য মনসবদারদের সেনাদের দেহের বর্ণনামূলক দলিল (Descriptive Roll) ও দাঘ্ (অশ্বের উপর দাগ)-প্রথার প্রচলন করা হয়। তথাপি মনসবদারী-প্রথার দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হয় নি।

মনসবদারী-প্রথার মূল্যায়ন

অবশ্য প্রথমদিকে মনসবদারী-প্রথা মোগল রাজতন্ত্র তথা রাষ্ট্রশক্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই প্রথার ফলে মোগল-সাম্রাজ্যে ইওরোপের সামন্ততন্ত্রের মত জাত-ভিত্তিক সামন্ততন্ত্র গড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। কারণ পদোন্নতি ও পুরস্কারের জন্য প্রতিটি মনসবদার সম্রাটের অনুগ্রহের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকতেন।

আকবর প্রতিটি সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহীদের দ্বিগুণ অশ্ব পোষণ করার নিয়ম চালু করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে সেনাবাহিনীর ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি ঘোড়সওয়ারদের ভরণ-পোষণের খাতে অর্থ হ্রাস করে ২০০ টাকা করেন। এছাড়া জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পরিবর্তন হল 'দু-আস্‌পা' (দুই ঘোড়ার সওয়ারি) ও 'শি-আস্‌পা' (তিন ঘোড়ার সওয়ারি) প্রথার প্রবর্তন। শাহজাহান মনসবদারী-প্রথা পুনর্গঠন করে আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মগুলি কিছু পরিমাণে পরিবর্তন করেন। এই সময় একশো সওয়ার-পদের মনসবদারদের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী ও সমসংখ্যক অশ্ব পোষণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বের ২১তম বছরে এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যার পরিবর্তে এক-পঞ্চমাংশ সংখ্যা প্রবর্তন করা হয় এবং এই নিয়ম ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।†

আকবরের পরবর্তী কালে মনসবদারী-প্রথার পরিবর্তন

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'দাঘ' ও 'চিহ্নিতকরণ' প্রথা নির্দিষ্টভাবে প্রণালীবদ্ধ করা হয়। 'দাঘ' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছ থেকে বছরে দুবার সার্টিফিকেট নিতে 'নগদি' মনসবদারদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে মনসবদারকে দুমাস অতিরিক্ত সময় দেওয়া হত। তৎসত্ত্বেও মনসবদার সার্টিফিকেট নিতে ব্যর্থ হলে আট মাসের অনূর্ধ বেতন থেকে বঞ্চিত করা হত। রাজত্বের ২৩তম বছরে ঔরঙ্গজেব এক ফরমান জারী করে নগদি ও জায়গির ভোগী মনসবদারদের যথাক্রমে প্রতি তিন মাস ও ছয় মাস অন্তর নিজ নিজ সেনাবাহিনীর পরিদর্শনের সময় ধার্য করা হয়।

---

* *অনিরুদ্ধ রায়—উল্লিখিত গ্রন্থ—পৃঃ ২৩৪।*

† *ঐ—পৃঃ ২২৩।*

অধ্যাপিকা শিরিণ মুসভি দেখিয়েছেন যে মাত্র ১৫৭১ জন মন্‌সবদার ৮২ শতাংশ রাজস্বের আয় ভোগ করত। এদের মধ্যে ১২ জন শতকরা ১৮ ভাগ রাজস্বের মালিকানা পায়। এভাবে মন্‌সবদারী ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রের আয় হ্রাস পাওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা চলে যে, মন্‌সবদারী ব্যবস্থা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এর ফলে ইওরোপের মত ভারতে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটতে পারে নি। অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের মতে মন্‌সবদারী ব্যবস্থার ফলে বহুজাতি-ধর্ম অধ্যুষিত ভারতে আঞ্চলিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। তবে মন্‌সবদারী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল স্ববিরোধী, কারণ এর ফলে একদিকে যেমন মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উপযোগিতা সুনিশ্চিত হয়েছিল, অন্যদিকে পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থার ক্রমিক শিথিলতা মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙ্গনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

সামরিক বিভাগ ঃ আকবরের সেনাবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌ-বাহিনী— এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

পদাতিক

'বন্দুকচি' (Banduqchi) বন্দুকধারী বা 'সমসেরবাজ' (Shamsherbaz) বা তরবারি যোদ্ধা, 'কাহার' বা ডুলি-বাহক, 'দরবান' (Darbans) বা সমারোপকরণবাহক প্রভৃতিকে নিয়ে পদাতিক বাহিনী গঠিত ছিল। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ অধিনায়ক, তবে তাঁর অধীনে একাধিক অধিনায়ক থাকতেন।

অশ্বারোহী বাহিনী

অশ্বারোহী বিভাগ ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ। মন্‌সবদারী-প্রথা প্রধানত অশ্বারোহী সৈনিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অশ্বারোহীরা মন্‌সবদার কর্তৃক নিযুক্ত হত ও তাঁদের কাছ থেকে বেতন পেত।

গোলন্দাজ বাহিনী

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন 'মীর-আতীশ' (Mir Atish) বা 'দারোগা-য়ে-তোপখানা' (Darogha-I-Topkhana)। মোগলরা তোপ ব্যবহারে বিশেষ পারদর্শী ছিল না। গোলন্দাজ বাহিনীর অধিকাংশই ছিল রুমিরা (কনস্টান্টিনোপল-এর অধিবাসী) ও পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা।

নৌ-বাহিনী

'মীর-বহর' (Mir Bahar) ছিলেন নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক। আকবরের পূর্বে মোগলদের নৌ-বাহিনী বলে বিশেষ কিছু ছিল না। মগ ও পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার থেকে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আকবর নৌ-বাহিনী গঠন করেন। লাহোর, এলাহাবাদ, কাশ্মীর ও ঢাকায় যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র ছিল। মোগল নৌ-বাহিনীতে কিছুসংখ্যক ইংরেজ ও ডাচ্ নাবিক ও গোলন্দাজ ছিল।

হস্তীবাহিনী

এছাড়া আকবরের সেনাবাহিনীতে বহু সংখ্যক রণহস্তীও থাকত। দশ, কুড়ি, ত্রিশটি হস্তী নিয়ে এক-একটি দল গঠিত হত। এই দলগুলিকে হাল্‌কা (Halqa) বলা হত। মন্‌সবদাররা অশ্ব ব্যতীত হস্তী রাখারও অধিকার পেত।

সেনাবাহিনীর ত্রুটি

স্মিথের মতে আকবরের কোন স্থায়ী সেনাদল ছিল না এবং এই কারণে সামরিক শক্তি ছিল দুর্বল। ব্লকম্যান (Blochman) বলেন, মাত্র ২৫,০০ সৈনিক বৃত্তি পেত। সুতরাং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির অনুপাতে এই সেনাবাহিনী ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু স্মিথ ও ব্লকম্যানের বিবরণ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ কাবুল অভিযানকালে আকবরের সেনাবাহিনীতে ৪৫,০০০ অশ্বারোহী ও ৫,০০০ রণহস্তী ছিল এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আকবরের সামরিক শাসন-প্রণালী ত্রুটিমুক্ত ছিল না। প্রথমত, যুদ্ধের ভার একাধিক সেনাপতির ওপর ন্যস্ত থাকায় তাদের মধ্যে প্রায়ই একনিষ্ঠার অভাব ঘটত। দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে সেনাপতিদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, নৌ-বাহিনী ছিল দুর্বল। এই কারণে ইওরোপীয়রা এদেশে এলে নৌ-যুদ্ধে

মোগলরা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। অনেকে মনে করেন, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হল উপযুক্ত নৌ-শক্তির অভাব। তৃতীয়ত, রাজপুত ও মুসলমান সেনাদের মধ্যে যুদ্ধকৌশলের প্রভেদ থাকায় অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। চতুর্থত, মোগল সেনাবাহিনীতে বাহ্যিক উপকরণবাহুল্য প্রবেশ করায় সেনাবাহিনীর দ্রুত চলাচলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হত।

সম্রাট সর্বোচ্চ বিচারক ঃ কাজী, মুফতি ও মীরে-আদল

বিচার ও শান্তিরক্ষা ঃ বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সম্রাট নিজেই। তিনি ছিলেন আইনের উৎস। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। কাজী 'শারিয়ৎ' বা ইসলামী আইন অনুসারে বিচার করতেন। তাঁকে 'মুফ্‌তি' ও 'মীরে-আলদ'রা সাহায্য করতেন। 'মুফ্‌তি' আইন ব্যাখ্যা করতেন, কাজী 'রায়' (Judgement) নিরূপণ করতেন এবং মীরে-আদল 'রায়' ঘোষণা করতেন। 'সদর-উস-সুদূর' ধর্মসংক্রান্ত এবং দেওয়ানী বিচার নিষ্পন্ন করতেন। রাজনৈতিক ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার প্রাদেশিক সুবাদাররা ও রাজস্ব-সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার প্রাদেশিক দেওয়ানরা নিষ্পন্ন করতেন। সুবাদার ও দেওয়ানের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটলে তার চূড়ান্ত মীমাংসার দায়িত্ব ছিল সম্রাটের।

প্রাদেশিক সুবাদার ও দেওয়ানের বিচারক্ষমতা

আইনকানুন

আকবরের আমলে কোন প্রকার লিখিত আইনকানুন প্রচলিত ছিল না। কোরানের নির্দেশ ও ইসলামী রীতি-নীতির ওপর নির্ভর করে বিচারকার্য সম্পাদন করা হত। জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রবর্তিত বারোটি আইন এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে রচিত 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয়।

দণ্ডবিধি

লঘু অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ডের বিধান ছিল। রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হত এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদানের একমাত্র অধিকারী ছিলেন সম্রাট।

শহরের শান্তিরক্ষক ছিলেন কতোয়াল

গ্রামীণ বিচারব্যবস্থা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ওপর ন্যস্ত ছিল। শহর অঞ্চলে শান্তিরক্ষার ভার 'কতোয়াল' নামক রাজকর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত থাকত। তাঁরা আধুনিক কালের পুলিশের দায়িত্ব পালন করতেন। কতোয়ালদের দায়িত্ব ছিল অপরাধীকে খুঁজে বের করা ও তাকে শাস্তি প্রদান করা, শহরে আগত অপরিচিতদের ওপর নজর রাখা, নাগরিকদের আয়-ব্যয় সম্পর্কে খোঁজ রাখা, রাত্রিতে শহর এলাকায় পাহারা দেওয়া এবং নাগরিকদের প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিধান করা। কখন কখন কতোয়ালকে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যও পালন করতে হত।

জেলার শান্তিরক্ষক ছিলেন ফৌজদার, গ্রামাঞ্চলের শান্তিরক্ষক গ্রাম্য-মোড়ল

জেলা বা পরগনার শান্তিরক্ষার ভার ফৌজদারের ওপর অর্পিত থাকত। একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল তাঁর অধীনে থাকত। তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল নিজ এলাকায় বিদ্রোহ দমন করা, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও তাদেরকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা। গ্রামাঞ্চলে কলোয়াল বা কোনরূপ পুলিশবাহিনী ছিল না। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার গ্রাম্য-মোড়লের ওপর ন্যস্ত থাকত।

প্রাদেশিক শাসন ঃ লোদী-আফগানগণ গোষ্ঠী-সর্দারদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-সর্দার তথা আফগান অভিজাতরা সমতার ভিত্তিতে ক্ষমতা ও সম্মান ভোগ করত। এই প্রথার ফলে প্রাদেশিক প্রশাসকরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং এদের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল নিতান্তই দুর্বল। কিন্তু তুর্কীরা সবল কেন্দ্রীয় শাসনে বিশ্বাসী ছিল। স্বল্পকালীন রাজত্বকালে এবং যুদ্ধবিগ্রহে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে বাবর ও হুমায়ুন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি।

আকবরই সর্বপ্রথম সুষ্ঠু প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর জায়গির-প্রথার পরিবর্তে সাম্রাজ্যকে পনেরটি 'সুবা' বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রাদেশিক শাসন-প্রণালী কেন্দ্রীয় শাসন-প্রণালীর অনুরূপ ছিল। সুবাদার ছিলেন সর্বোচ্চ প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তিনি 'নাজিম' ও 'সাহেব-সুবা' নামেও অভিহিত হতেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি। তিনি প্রদেশের সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক। কিন্তু তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন করতে ও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারতেন না। প্রত্যেক সুবায় একজন করে দেওয়ান থাকতেন। তিনি ছিলেন রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। দেওয়ান সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সুবাদারের খবরদারী থেকে মুক্ত থাকতেন। দেওয়ান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। নতুন কর্মচারী নিয়োগ ও কর্মচারী বরখাস্তের সকল ব্যাপার তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। তিনি রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন। সুবাদারের সঙ্গে কোন বিষয়ে দেওয়ানের মতান্তর ঘটলে তা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া হত।

পনেরটি সুবায় সাম্রাজ্য বিভক্ত

সুবাদার

দেওয়ান

কেন্দ্রীয় সরকারের বক্সীর মত প্রাদেশিক সরকারেও বক্সী নামক এক কর্মচারী নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর পদমর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় বক্সীর সমতুল। প্রদেশের বা সুবা-র সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের বেতনের হিসাব পরীক্ষা করে তার অনুমোদনের একমাত্র অধিকারী ছিলেন বক্সী।

বক্সী

অন্যান্য প্রাদেশিক রাজকর্মচারীদের মধ্যে সদর-উস-সুদূর (ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী), কাজী (বিচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী), আমিল (রাজস্ববিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী) প্রভৃতি কর্মচারীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সদর-উস-সুদূর, কাজী ও আমিল

প্রদেশগুলি কয়েকটি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল। সরকারের শাসনভার ছিল ফৌজদারের ওপর। ফৌজদার সেনা দিয়ে সুবাদারকে সাহায্য করতেন। 'অমলগুজার'-নামক কর্মচারী ছিলেন সরকারের রাজস্ব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। সরকারগুলি পরগনা ও মহলে বিভক্ত ছিল। গ্রামাঞ্চলে কানুনগো, মুকাদ্দম ও পটোয়ারী ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

সরকার, পরগনা ও মহল

আকবরের সংস্কারসমূহ : আকবর বহুবিধ প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) হিন্দুদের সহানুভূতি লাভ করার উদ্দেশ্যে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তীর্থকর (Pilgrim tax) তুলে দেন।

(২) ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সহধর্মীদের অজস্র প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আকবর জিজিয়া-কর বাতিল করে মুসলমান ও হিন্দু প্রজাদের মধ্যে কৃত্রিম প্রভেদ ও হিন্দুদের অসন্তোষ দূর করেন।

(৩) আকবর হিন্দুসমাজে প্রচলিত নিষ্ঠুর 'সতীদাহ'-প্রথা রদ করতে যত্নবান হন এবং কোন বিধবাকে বলপূর্বক তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে বাধ্য করা যাবে না বলে আদেশ জারী করেন।

(৪) আকবর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বাল্যবিবাহ-প্রথাও রদ করতে যত্নবান হন। তিনি ষোল বছরের নিচে বালকের এবং চৌদ্দ বছরের নিচের বালিকার বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি

মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেও এই নিয়ম প্রবর্তন করেন। প্রতিটি শহর এলাকায় 'তুরবেগ'-নামক কর্মচারীর ওপর এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখার ভার অর্পিত হয়। আকবর পণ-প্রথা ও বহুবিবাহ-প্রথারও বিরোধী ছিলেন।

(৫) আকবর যুদ্ধবন্দী হিন্দুদের ক্রীতদাস করার রীতিও নিষিদ্ধ করেন।

(৬) আকবর জায়গির-প্রথা বন্ধ করে সমস্ত জায়গির 'খাস' করে দেন। কর্মচারীদের জায়গির দেওয়ার পরিবর্তে তিনি বেতন দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন।

(৭) আকবর কেন্দ্রীয় টাকশাল (mint) বিভাগে সংস্কার প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশ, লাহোর, জৌনপুর, গুজরাট ও পাটনা প্রভৃতি প্রাদেশিক টাকশালে তিনি বিভিন্ন পদের কর্মচারী নিযুক্ত করে তাদের ওপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন করেন। স্মিথ আকবরের মুদ্রা-নীতির প্রশংসা করে বলেন, "Akbar deserves high credit for the excellence of his extremely barred coinage as regards purity of metal and fullness of weight and artistic execution."

আকবরের ধর্মনীতি

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রধানতম দিক হল তাঁর উদার সহিষ্ণু মানবতাবাদী ধর্মনীতি। সামরিক প্রতিভাবলে তিনি যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, অন্যদিকে সংগঠনী প্রতিভা দিয়ে তিনি সেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ভারতে যে জাতীয় সাম্রাজ্য গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা এককথায় অভাবনীয়। ইসলামীয় বিধান অনুসারে ধর্মীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়ে আকবর মানবতাবাদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতার পরিচয় দেন। সমসাময়িক বিশ্বে আর কেউ এরকম কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না। ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ ও ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী ও পারস্যের রাজা প্রথম আব্বাস ধর্মীয় শান্তি ও সংহতি স্থাপনে সফল হন নি।

ষোড়শ শতাব্দী ছিল অনুসন্ধিৎসা ও সন্দেহের যুগ এবং আকবর ছিলেন এইরূপ যুগোচিত মনোভাবের মূর্ত প্রতীক। কবীর, নানক, চৈতন্য প্রমুখ ধর্মপ্রচারকরা আকবরের ধর্মনীতির ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করেছিল। এই সকল ধর্মাচার্যদের মত আকবরও সকল ধর্মের সর্বজনীনতায় ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলমান নৃপতিদের মধ্যে আকবরই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করতে যত্নবান হন। তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনীতিকে ইসলাম তথা উলেমাদের প্রভাবমুক্ত করে হিন্দু-মুসলমান মিলনের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হন। ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে আকবরই সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্য দূর করে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃতি সংশোধন করতে প্রয়াসী হন। এক প্রতিভাপন্ন রাষ্ট্রবিদ্ হিসেবে তিনি হিন্দুদের 'ধর্মীয় দাসে' (religious helots) পরিণত করার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। মোগল-বিরোধী শক্তিগুলির ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি রাজপুতদের সন্তুষ্টিবিধানে যত্নবান হন এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের প্রতি সহনশীল নীতি গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি রাজত্বের অষ্টম ও নবম বর্ষে হিন্দুদের ওপর থেকে যথাক্রমে তীর্থকর ও জিজিয়া-কর তুলে দেন। সুতরাং দেখা যায় যে সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের মত আকবরের ধর্মনীতি রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও আকবর ছিলেন সত্যানুসন্ধী। ধর্মের স্বরূপ জানার জন্য তিনি যে আন্তরিকভাবে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন একথা তাঁর ধর্মমতের বিরোধী গোঁড়া সুন্নী বদাউনী পর্যন্তও স্বীকার করেছেন। বদাউনী লিখেছেন, "Akbar would sit many a morning alone in prayers and melancholy near the palace in a lonely spot with his

head bent over his chest and gathering the bliss of early hours." বস্তুতপক্ষে আধ্যাত্মিক পিপাসাই তাঁকে সকল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে এবং সমস্ত ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আকবরের উদার ধর্ম-নীতির কারণ : আকবরের ধর্মনীতির ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমত, তৈমুর লঙ্গের বংশধররা ছিলেন সুফী-মতবাদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত। তাঁর পিতা ও পিতামহের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাঁর মাতা ছিলেন সিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। মাতার উদারতা, মানসিক উৎকর্ষ এবং পরধর্মসহিষ্ণুতা আকবরকে বাল্যকাল থেকে স্বভাবতই প্রভাবিত করে।

বংশের প্রভাব

দ্বিতীয়ত, আপন রাজপুত মহিষীদের প্রভাব এবং সমকালীন হিন্দু ধর্মাচার্যদের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন তাঁর উদার ধর্মমতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, পারস্য থেকে আগত সুফী-পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং আব্দুল লতিফের শিক্ষার ফলে তাঁর মনে ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব গড়ে ওঠে। চতুর্থত, শেখ মোবারক ও তাঁর পুত্রদ্বয় ফৈজী ও আবুল ফজলের সঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ফলে তিনি ইসলামী গোঁড়ামির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং উলেমাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। পঞ্চমত, ধর্মালোচনার জন্য তিনি ফতেপুর-সিক্রীতে একটি 'ইবাদৎখানা' বা উপাসনামন্দির নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দু, জৈন, পার্শী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের ধর্মজ্ঞানীদের সেখানে আমন্ত্রণ করে তিনি ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা শুনতেন। ইবাদৎখানায় আমন্ত্রিত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে হিন্দুধর্মের 'পুরুষোত্তম, দেবী জৈনধর্মের হরিবিজয় সুরী ও বিজয়সেন সুরী এবং জেসুইট ধর্মযাজক ফাদার রিডোলফো-একোয়া-ভাইবা ও ফাদার এ্যান্টনি এবং মন্‌সেরেট-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক থেকে আকবরের এই ধারণা হয় যে, সকল ধর্মের সারবস্তু এক এবং অভিন্ন। ষষ্ঠত, রাজনৈতিক কারণেও তিনি উদারনীতি গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তিনি এটি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, হিন্দুদের সহযোগিতা ভিন্ন সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে না ; কারণ হিন্দুরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন আকবর রাজত্বের প্রথম দিকে চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাদের মধ্যে আফগানরাই ছিল সর্বাধিক প্রবল। এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে হিন্দুদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক ও উদার-নীতি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং আকবরের ধর্মনীতিতে উদারতা ও বাস্তববোধের সমন্বয় ঘটেছিল (Akbar's broad-mindedness was, therefore as much the result of his liberal ideas as it was dictated by the exigencies of the problems of state—A New advanced History of India—চোপরা, পুরী, দাস, পৃঃ ৩৩০)।

রাজপুত মহিষীদের প্রভাব, সুফীদের প্রভাব, ফৈজী ও আবুল ফজলের প্রভাব, ইবাদৎখানার প্রভাব

আকবরের ধর্মজীবন মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত—(১) ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামধর্ম মেনে চলতেন। সেই বছর তীর্থযাত্রীরূপে আজমীর গমন করেছিলেন। (২) ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তাঁর ধর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় এবং মৌলবাদী ইসলামধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ক্রমশ কমতে থাকে। উলেমাদের ধর্মান্ধতায় বিরক্ত হয়ে তিনি তাদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করা। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফতেপুর-সিক্রীর মসজিদের মুসলমান পুরোহিতকে বিতাড়িত করে সেই স্থান তিনি নিজেই দখল করেন। মোবারকের পরামর্শক্রমে আকবর ধর্মীয় ব্যাপারে সকল ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে অগ্রণী হন এবং মোবারক রচিত একটি দলিল প্রচার করে তিনি নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্মব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন

আকবরের ধর্মজীবনের তিনটি পর্যায়

করেন। স্মিথ এই দলিলটিকে 'অভ্রান্ত কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallibility Decree) বলে অভিহিত করেছেন। এই দলিলটিকে আকবরের রাজত্বের 'এ্যাক্ট অব্ সুপ্রিমেসি' (Act of Supremacy) বলা যায়। এই অনুশাসনের মূল কথা ছিল যে, ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে মতান্তর ঘটলে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে যদি অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত পবিত্র কোরানের বিরোধী না হয়।

আকবরের এই 'অভ্রান্তবাদ' ঘোষণা গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর দারুণ আঘাত হেনেছিল। স্মিথ বলেন যে, এই দলিলটি প্রচারিত করার দুই এক বছরের মধ্যেই আকবর ইসলাম-বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্তু স্মিথের এই মন্তব্যের কোন সমর্থন পাওয়া যায় নি। মুসলমানধর্মের অভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান করে এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে এই ধর্মকে সকলের গ্রহণযোগ্য করে তোলাই যে আকবরের উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আকবরের ধর্মজীবনের তৃতীয় পর্যায় হল ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'দীন-ই-ইলাহী' (Din-i-Ilahi) নামক এক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমতের প্রবর্তন। বিভিন্ন ধর্মের সারবস্তু মিশ্রণ করে আকবর এই ধর্মমত উদ্ভাবন করেন। এতে সকল ধর্মের দর্শন স্থান পেয়েছিল। এই ধর্মমতের মূল কথা ছিল, নিরামিষ ভোজন ও দান-ধর্ম পালন করা, পরস্পরকে 'আল্লা-হ-আকবর' সম্বোধনের দ্বারা সম্ভাষণ করা এবং সম্রাটের জন্য ধন, মান, প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার শপথ গ্রহণ করা।

'দীন-ই-ইলাহী'

বদাউনী বলেন যে, 'দীন-ই-ইলাহী' প্রবর্তনের পর আকবর বহুবিধ মুসলমান-বিরোধী অনুশাসন প্রচার করেছিলেন। যেমন, মুসলমানদের সাপ্তাহিক সাধারণ প্রার্থনা, তাদের রমজানের উপবাস, গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ, নতুন মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ এবং মক্কাতীর্থ যাত্রা প্রভৃতি বহুবিধ ইসলামী আচার-পদ্ধতি নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বদাউনীর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, তিনি জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে এরূপ মন্তব্য করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী। এছাড়া আবুল ফজল অতিরিক্ত রাজানুগ্রহ লাভ করায় তিনি আকবরের প্রতি রুষ্টও ছিলেন। পরবর্তী কালে মহম্মদ সাদিক 'তবকত্-ই-শাহজাহানি' গ্রন্থে বদাউনীর মতই লিখেছেন যে, আকবর রাজত্বকালের শেষভাগে মুসলিম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং মুসলিমদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন, কিন্তু এই মতের সমর্থনে বিশেষ প্রমাণ নেই।

বদাউনীর মন্তব্য

বদাউনী ও জেসুইটদের সমালোচনা অনুসরণ করে স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, 'দীন-ই-ইলাহী' ইসলাম-বিরোধী একটি নতুন ধর্ম এবং এটি ছিল তাঁর নির্বুদ্ধিতার চরম নিদর্শন। তাঁর কথায় "The Divine faith (Din-i-Ilahi) was a monument of Akbar's folly". কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'দীন-ই-ইলাহী' সকল ধর্মের সার-সঙ্কলন মাত্র। ইসলামধর্মেরও অনেক ভাল কথা এতে স্থান পেয়েছিল। এই ধর্মমতে কোন বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য বা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নি। দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করার মূলে আকবরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক সূত্রে গ্রথিত করে ভারতবাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা। আকবরের এই আদর্শ ছিল মহান্ সন্দেহ নেই। তিনি উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। নানা সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি সামাজিক ঐক্যসাধনেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই ঐক্যবন্ধনের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন ছিল কোন এক ধর্মীয় বন্ধন। অর্থাৎ তিনি এক সার্বজনীন ধর্মীয় বন্ধনের ওপরেই অধিক গুরুত্ব দেন। এরই ফলশ্রুতি হল 'দীন-ই-ইলাহী'-র উদ্ভাবন। ধর্মীয় সমন্বয়ের আদর্শ উপস্থাপিত করে আকবর 'দীন-ই-

স্মিথের মন্তব্য

ইলাহী'কে ভারতের জাতীয় ধর্মে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আকবর ধর্মপ্রচারক ছিলেন না এবং কাউকেও এই ধর্মমত গ্রহণ করতে বাধ্যও করেন নি। এছাড়া এই ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট শাস্ত্র ছিল না, উপাসনালয় বলে কিছু ছিল না বা কোনরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এক বিশিষ্ট ধর্ম প্রবর্তন করার কোন অভিপ্রায় আকবরের ছিল না। আবুল ফজল ও বদাউনী এই তথাকথিত ধর্মের নামকরণ করেন 'তোওহিদ্-ই-ইলাহী' যার যথার্থ মর্মার্থ হল 'স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ' (Divine Monotheism)। প্রায় আশি বছর পরে 'দীন' বা 'বিশ্বাস' এই শব্দটি যুক্ত হয়। সুফীপন্থার মত 'তোওহিদ-ই-ইলাহী' ছিল এক নতুন সম্প্রদায় বা সিলসিলাহ্। যারা স্বেচ্ছায় এই সম্প্রদায়ে যোগ দিতে চাইত বা সম্রাট যাদের অনুমোদন করতেন তারাই একমাত্র সদস্য হতে পারত। একমাত্র রবিবার দিনটিই ছিল দীক্ষা দেওয়ার দিন। সদস্যদের দিনে তিনবার (প্রত্যুষে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়) প্রার্থনা করতে হত। মুসলিম 'নমাজ'-এর মত দীন-ই-ইলাহী-তে কোন বাধাধরা প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল না। একেশ্বরবাদ-ই ছিল দীন-ই-ইলাহী-র মর্মকথা। এই ধর্মে পুরোহিতের কোন স্থান ছিল না। আকবরই ছিলেন একমাত্র গুরু। আকবরকেই 'ইনসান-ই-কামিল' বা সদ্গুণসম্পন্ন মানুষ বলে বিবেচনা করা হত। সুতরাং দীন-ই-ইলাহীকে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বলা যায় না। রাজসভায় কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল এবং এদের মধ্যে একমাত্র হিন্দু ছিলেন বীরবল। আকবর ঐকান্তিকভাবে ধর্মসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এরূপ দৃষ্টান্তের অভাবও নেই। তাঁর ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল 'সুলহেকুল' বা পরধর্মসহিষ্ণুতা। এই কারণেই ভন্‌নোর (Von Noer) যথার্থ মন্তব্য করেছেন "One of his (akbar's) creations will assure to him for all time a prominent place among the benefactors of humanity, greatness and universal toleration in matters of religious belief."

দীন-ই-ইলাহী কোন নতুন ধর্ম নয়

'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মমত প্রবর্তনের মূলে আকবরের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধন করা। শুধু রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করেই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঐক্যসাধনের বাসনা তাঁর ছিল। তিনি এমন একটি জাতীয় ধর্ম প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হত। ধর্মের ছাপ থাকলেও বস্তুত 'দীন-ই-ইলাহী' ছিল একটি রাজনৈতিক দলিল। এতে কতকগুলি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতির সমন্বয় করা হয়েছিল। প্রথমত, 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মমতের প্রচারের ফলে জনসাধারণ সম্রাটকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ও প্রজাহিতৈষী বলে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের অতি কাছে এসে পৌঁছেছিল এবং এদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধের উন্মেষ হয়েছিল। তৃতীয়ত, 'দীন-ই-ইলাহী' প্রচারের ফলে ধর্মান্ধ উলেমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একরূপ বিনষ্ট হয়েছিল এবং ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সম্রাটের সর্বময় প্রভুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল। চতুর্থত, অধ্যাপক আতাহার আলি মনে করেন, এর ফলে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সুসংহত শাসকগোষ্ঠী গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। ("Given India's variegated culture and multiplicity of religious beliefs, what Akbars was attempting to secure was an integrated ruling class").

'দীন-ই-ইলাহী'র রাজনৈতিক গুরুত্ব

আকবর ও শের শাহের মধ্যে তুলনা

উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য : এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, সীজার ও অগস্টাস এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল—আকবর ও শের শাহের মধ্যেও সেই প্রকার সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শের শাহ্ ছিলেন আকবরের অগ্রদূত এবং তিনি আকবরের নীতি

ও কার্যপ্রণালীর ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। এই কারণে উভয়ের আদর্শ ও কৃতিত্বের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

উভয়ের সাম্রাজ্যবাদ আদর্শ ঃ আকবর ও শের শাহ্ উভয়েই ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু শের শাহ্ অপেক্ষা আকবরই এ বিষয়ে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শের শাহ্ কর্তৃক স্থাপিত সাম্রাজ্য তাঁর বংশধরদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার ফলে অধিকদিন স্থায়ী হতে পারে নি। কিন্তু আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য, তাঁর শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বংশধরদের সুযোগ্য শাসনের ফলে দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

উভয়ের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ঃ উভয়েই সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। 'রাজতন্ত্রের আদর্শ' (ideal of kingship) সম্বন্ধে উভয়ের ধারণা ছিল উচ্চ। উভয়েই প্রজাহিতৈষী স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই ছিল উভয়ের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। প্রচলিত রাজনীতি, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি চিরাচরিত-প্রথা উভয়ের শাসনব্যবস্থায় স্থান পেয়েছিল।

উভয়ের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আদর্শ ঃ উভয়েই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এই বিষয়ে শের শাহ্ই ছিলেন আকবরের পথিকৃৎ। হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান এবং হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করার নীতি শের শাহ্ই সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন। আকবরও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে মুক্ত রেখে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া-কর তুলে দিয়ে আকবর তাদের অখণ্ড আনুগত্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শের শাহ্ এবং আকবর উভয়েই উদার-ধর্মনীতি কার্যকর করতে যত্নবান হয়েছিলেন।

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ স্মিথের মতে, 'ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে আকবর একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারেন। এই দাবির মূলে আছে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা, মৌলিক আদর্শ ও মহান্ কৃতিত্ব''। 'আইনে-আকবরী', 'আকবর-নামা', 'তুজুকে-জাহাঙ্গীরি' এবং মন্সেরেটের বিবরণীতে আকবরের ব্যক্তিত্ব ও রাজোচিত আভিজাত্যের বর্ণনা আছে। মন্সেরেট বলেন, "He was in face and stature fit for the dignity of a king"। আকবরের চরিত্রে বহুবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। চারিত্রিক মাধুর্য ও প্রজাহিতৈষণার জন্য যে সকল নৃপতিরা অমরত্ব লাভ করেছেন, আকবর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অসাধারণ মানসিক উৎকর্ষ ও দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সকল বিপদে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। তিনি একাধারে ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা, সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন সেনাপতি, প্রজারঞ্জক রাজা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট। তাঁর স্নেহপ্রবণতা ছিল প্রবল। বিদ্রোহী মীর্জা হাকিম, বৈরাম খাঁ ও সেলিমের প্রতি ব্যবহারে তাঁর চারিত্রিক কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুবার মাত্র তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও দুর্বলতার প্রতি কঠোরতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ফাদার জেরোমোর মতে, "In truth, he was great with the great and lowly with the lowly."

স্মিথের মন্তব্য

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও রাজোচিত আভিজাত্য

বহুগুণের সমাবেশ

'সম্রাট ঈশ্বরের ছায়া ও প্রতিনিধি' এই ধারণার সঙ্গে ভারতের মুসলমান শাসকদের সম্যক পরিচয় ছিল। এই ধারণার কিছু অতিরিক্ত ধারণা বা আদর্শ হুমায়ুনের ছিল। তিনি নিজেকে মানব জগতের মধ্যমণি বলে মনে করতেন—যেমন সূর্য জগতের কেন্দ্রস্থল। এই দুটি ধারণা নতুন বলে প্রতিভাত হলেও বস্তুত তা ছিল না। আবুল ফজল কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আকবর কর্তৃক সমর্থিত নরপতিত্বের

আকবরের নরপতিত্বের আদর্শ

আদর্শে এই দুটি ধারণা সংযোজিত হয় এবং উপরন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয় মোগলদের পৌরাণিক উৎপত্তি। "যেদিন যে আলো বহু সাধুসন্ত ও সম্রাটদের ভিতর থেকে আলানকুয়ার (Alanquwa) ওপর এসে পড়েছিল সেদিনই হল মহিমময়ের (Majesty) প্রথম প্রকাশ"।* নরপতিত্বের এই আদর্শ মোগল ও রাজপুতদের কাছে মোটেই অজ্ঞাত ছিল না কারণ মোগল ও রাজপুতরা নিজেদের যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত বলে দাবি করত। ভারতীয় সুন্নী মুসলমানরা মোগলদের নরপতিত্বের এই আদর্শের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় তাঁরা এই আদর্শের মধ্যে কিছু অভিনবত্ব খুঁজে পেয়েছিল।

মহান্ মোগল বিজেতা ও বীরদের উত্তরসূরী এবং নিজে এক সাফল্যমণ্ডিত যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও আকবর একমাত্র সামরিক শক্তির ওপর নরপতিত্বের আদর্শ স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মনে হয় আকবর অন্যান্য সম্রাটদের মত নিজের লৌহহস্ত ভেলভেট্ দস্তানার মধ্যে গোপন রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হয় যে, তিনি রাজতন্ত্রকে এক মহান্ মিশন্ বা লক্ষ্য বলে বিশ্বাস করতেন। সবল রাজতন্ত্রের সপক্ষে আবুল ফজল-এর যুক্তি হল এই যে, মানুষ মাত্রই হল স্বার্থপরায়ণ, লোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব একান্তই বিরল। সুতরাং শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য আবুল ফজল এক সবল রাজতন্ত্রের সুপারিশ করেন। তাঁর ভাষায় "A kings is therefore the origin of stability and prosperity." আবুল ফজল ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত সর্বাত্মক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও এর উগ্র সমর্থক ছিলেন। তিনি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের কথাও প্রচার করেন। সেই সঙ্গে আবুল ফজল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শের কথাও প্রচার করেন। মোগলজাতির মহান্ ঐতিহ্য ও ভারতীয়দের রাজতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আকবর এক বিশ্ব-সাম্রাজ্য ও সার্বজনীন (universal) রাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর. পি. ত্রিপাঠী (R. P. Tripathi)-র মতে "Akbar's idea was not so much national as of universal kingship."† প্রকৃতপক্ষে মোগলদের উত্তরসূরী হিসেবে আকবর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও নরপতিত্বের যে আদর্শ লাভ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে ছিল বিশ্ব-সাম্রাজ্য ও সার্বজনীন রাজতন্ত্রের প্রতীক।

রাজতন্ত্র ও রাজকর্তব্য সম্বন্ধে আকবরের আদর্শ ছিল মহান্। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, "বিশ্বের প্রতিপালক সম্রাটের পক্ষে অত্যাচারী হওয়া অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ"। প্রবল ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মাধুর্য এবং গভীর সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের দ্বারা আকবর ভারতীয় ও বিদেশীদের চোখে মোগল রাজতন্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন সন্দেহ নেই। মুসলমান, মোগল ও হিন্দু নরপতিত্বের আদর্শের সমন্বয়ে আকবরের নরপতিত্বের আদর্শ বিবর্তিত হয়েছিল বলা যায়।

নিরক্ষর হলেও আকবরের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা, মানসিক উৎকর্ষ ও মৌলিকতার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ এবং অপরের

বিদ্যোৎসাহিতা

মুখে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করে নিজ বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তা অনুধাবন করতে পারতেন। তাঁর রাজসভা ফৈজী, আবুল ফজল, ভানুচন্দ্র, হরিবিজয়, একোয়া-ভাইবা, মন্‌সেরেট প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতরা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

কৃতিত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে আকবরকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করা যায়। তিনিই ছিলেন মোগল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় মোগল-সাম্রাজ্য যেরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে একে উদ্ধার করা একটি চোদ্দ বছর বয়স্ক বালকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। হিমু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলে আকবরকে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বালক সম্রাট

* দ্রষ্টব্য, আর. পি. ত্রিপাঠী—*Same aspects of muslim administration*— পৃঃ ১৩৬।
† ঐ-পৃঃ ১৩৭।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা

শাসন-দক্ষতা ও জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন

আকবর তা উপেক্ষা করে অকুতোভয়ে হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করে পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তাঁর সংগঠনী প্রতিভাও ছিল প্রশংসনীয়। তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলমান শাসক—যাঁর শাসনের মূল দেশের মৃত্তিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করে এর স্থায়িত্বের জন্য তিনি বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলমান সম্রাট যিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও সম্প্রীতির ওপর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে যত্নবান হয়েছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর নীতি ও ব্যবহার ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। তিনি হিন্দুদের অখণ্ড আনুগত্য ও সহযোগিতা লাভ করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন। প্রজাবর্গের মধ্যে জাতিধর্মের বিভেদ দূর করে এবং শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় এবং পারসিক-আরবীয় ("Perso-Arabic system in Indian setting"—Jadunath) শাসননীতির সংমিশ্রণ করে তিনি একটি জাতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। টোডরমলের রাজস্ব-ব্যবস্থা আকবরের রাজত্বের এক অপূর্ব কীর্তি।

সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

ভারতীয় মুসলমান সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে আকবরের রাজত্বকাল এক গৌরবময় যুগ। আবুল ফজল, নিজামউদ্দিন এবং বদাউনী আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর রাজত্বকালে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তাঁর আদেশে 'কথাসরিৎসাগর', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'অথর্ববেদ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

স্থাপত্য ও শিল্পের উন্নয়ন

তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আকবরের সময় নির্মিত হর্ম্যাদির গঠনকার্যে হিন্দু ও পারসিক উভয়রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। ফতেপুর-সিক্রী, হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রা দুর্গে অবস্থিত জাহাঙ্গীর মহল আকবরের স্থাপত্য-কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আকবরের উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে। আকবরের দরবারে প্রসিদ্ধ গায়কদের সমাবেশ হয়েছিল। এদের মধ্যে তানসেন ও তাঁর পুত্র সুরত সেন, মালবের রাজা বাজবাহাদুর, অন্ধ গায়ক সুরদাস, রামদাস মুঠিয়া প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে তানসেন ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতনামা। ইতিপূর্বে তিনি মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার শাসনকর্তা রামচাঁদের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

আকবর ও খ্রীস্টান যাজকসম্প্রদায় ঃ এরকম ধারণা প্রচলিত আছে যে, "খ্রীস্টান যাজকসম্প্রদায়ের (jesuits) কাছে আকবর প্রথমদিকে ছিলেন উৎসাহব্যঞ্জক, পরে এক বাধাস্বরূপ এবং শেষ পর্যন্ত ঘোর নিরুৎসাহব্যঞ্জক"। এই উক্তি মোটেই অতিরঞ্জিত নয়।

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্বে উপকূলে ইওরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম আকবরের সংস্পর্শে আসে। মক্কায় মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর কোন অত্যাচার করবে না, এই প্রতিশ্রুতির ওপর আকবর পর্তুগীজদের কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করেন।

সকল ধর্মের সারকথা জানার জন্য আকবর যখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিলেন, সেই সময় খ্রীষ্টধর্মের মূল আদর্শ জানতেও আগ্রহী হন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীষ্টান পাদরি আহ্বান করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সাতগাঁও-এর ভাইসার-জেনারেল জুলিয়ান পেরিরিয়া ও হুগলী বন্দরে পর্তুগীজ অধিনায়ক পিট্রো ট্যাভার্সকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

খ্রীষ্টধর্মের মূল আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য আকবর ক্রমেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। মোগল দরবারে দুজন শাস্ত্রজ্ঞ খ্রীষ্টান পাদরিকে পাঠানোর জন্য তিনি গোয়ার আর্চবিশপকে